শারদীয়া

জেলার খবর সমীক্ষা

ষষ্ঠ বর্ষ

আশ্বিন ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৩

নিবন্ধের নিবন্ধন ঃ

দুর্জ্ঞেয় দুর্গা
সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ৪

বিহরে রণে কে রে বামা মৃগেন্দ্রবাহনে!
শিবেন্দু মান্না ৬

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে কতিপয় বঙ্গনারীর প্রতিভা (উনিশ শতকও পূর্বে)
দুঃখহরণঠাকুর চক্রবর্তী ১০

বিভূতিভূষণ ও মধ্যকলকাতার এক বিদ্যালয়
তাপস বাগ ২৭

হাওড়ার ইতিহাসে ঐতিহাসিক সুভাষচন্দ্র
অনুপম মুখোপাধ্যায় ৩৪

ভারতের প্রাণ বায়ু ধর্ম
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ৮

শতবর্ষে ভারতীয় চলচ্চিত্র
জহর চট্টোপাধ্যায় ১৭

না নিবন্ধ ঃ

যাত্রাসঙ্গী
প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য্য ১৪

শরৎ-রবীন্দ্র উবাচ
অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় ২৪

বাংলার আইনজীবী পেশার জন্ম
কাজল সেন ২৫

অঙ্কের মজা
শ্বাশত দাস ৯

ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ

দুর্গাপুরের কিছু প্রত্ন ও পুরবৈচিত্র
সোমনাথ রায় ১৫

স্মৃতিকথা ঃ

বলাই ষাট
পল্টু ভট্টাচার্য ২৮

সঙ্গীতরসিকের কলমে ঃ

হাওড়া শহরে সঙ্গীত চর্চা ঃ সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা
শ্রীসুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২

গল্পের দরবার ঃ

নীল - স্বর্গ
এস. কে. মেহবুব ৩৬

সত্যি বলো আমার বাবা কে
উত্তম কুমার পাল ৩১

উন্মেষ
অনিতা খোটেল ৩৮

চিকিৎসক উবাচ ঃ

প্রসঙ্গ হাঁটুর চোট
ডাঃ চন্দন দে হাজরা ২৩

খেলার দুনিয়া ঃ

হায় ! অলিম্পিক
রাজকুমার মন্ডল ২০

ছন্দবাণী ঃ

মা
অপর্না মাজী ৩৯

মা সারদামণি দেবী
শ্রেয়াশ্রী সিন্‌হা ৩০

মর্ত্য বিতর্ক
অমিত কুমার রায় ২৯

ভাবনা
বিভা হাজরা ৩০

আমি
প্রতিম চ্যাটার্জী ৩৩

আত্মীয় পাখিরা
তমশ্রী দাস ৩৩

মানবতার মিছিলে
সেখ গুলজার হোসেন ৩৩

জীবন মৃত্যু
চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র ৩০

যুগের হাওয়া
মালতী দাস ২৬

ক্ষতটা বেঁচে থাকুক
প্রণব কুমার দাস ৩৯

বিবেকের কাছে
তপন ভৌমিক ৩৯

মতামত ঃ ৪০

সম্পাদকীয়

আবার এল শরৎ
আকাশ আবার নীল
বর্ষা দিনের শেষে
তারারা ঝিলমিল
আগমনীর সুর
বাজছে সবার মনে
পুজোর কদিন বাকি
সবাই যে দিন গোনে
পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেলেতে
উৎসবেরই গান
সব অভাব আর অশান্তির
হোক না অবসান
সারা দেশে দুর্নীতি আর
অভাব অভিযোগ
শহর জুড়ে ডেঙ্গু এবং
মারণ যত রোগ
ঘুচে যাবে এক নিমেষে
দেবীর আগমনে
সেই কামনাই দেবীর কাছে
জানাই মনে মনে
পুজো আসুক প্রতিবছর
অসুর দলন হোক
সব তমসা কেটে গিয়ে
আলোয় ভরুক চোখ।

শারদ উৎসবের দিনগুলো হয়ে উঠুক আনন্দ এবং প্রীতিপূর্ণ। ঐক্য বজায় থাকুক এবং এই আনন্দ, প্রীতি ও ঐক্য, উৎসবের দিনগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের মনে সারা বছরই ছড়াক সৌরভ। এই কামনা সহ পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী সবাইকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা।

- সম্পাদক

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
কম খরচে কম্পিউটার শিক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
রোটারি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার
সহযোগিতায় ঃ আই.সি.এ. ও রোটারি ক্লাব অফ সল্টলেক মেট্রোপলিটন
পরিচালনায় ঃ আর.সি.সি. ভাতেঘরী জনকল্যাণ সমিতি
ভাতেঘরী, জয়পুর, হাওড়া - ৭১১৪০১
মানস কুমার মাজী (৯৯৩২০০৭১৬১)

With Best Compliments From :--
A WELL WISHER
SAROJIT MANNA

রাজ্য সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে
প্রয়াগ গ্রুপ
মানুষের পাশে, মানুষের সাথে
আপনি স্বপ্ন দেখবেন, আমি বাস্তবায়িত করবো।
আসুন আমরা সকলে মাসিক জমা স্কিম, এককালীন জমা এবং মাসিক ফেরৎ স্কিমের সাথে যুক্ত হই।
যোগাযোগ ঃ **অমিত কুমার রায়** (৯৬১৪২৯৮৪২৪)
ঝিখিরা, জয়পুর, হাওড়া।
সৌজন্যে - এন. পি. ইলেকট্রনিক্স

দুর্জ্ঞেয় দুর্গা

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

দুর্গার পুজো কিভাবে চালু হল সে রহস্য এখনও দানা বেঁধেই আছে। মুশকিল হল দুর্গা শুধু ভারতে পূজিতা নন, ভারতের বাইরে জাপান, মিশর, ব্যবিলন, সিরিয়া প্রভৃতি নানাদেশে নানা নামের দুর্গার সদৃশ মূর্তি পাওয়া গেছে এবং সেগুলি যথেষ্ট প্রাচীন। পুজোর উৎস নিয়ে নানা জনের নানা মত। কেউ বলেন মার্কন্ডেয় পুরাণের (৪০০-৫০০খ্রি.) চন্ডীই দুর্গা, বাংলাদেশে কালিকাপুরাণের পরে দশম খ্রীষ্টাব্দে দুর্গার পুজো চালু হয়েছে। মার্কন্ডেয় পুরাণে রয়েছে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির কথা। কারো মতে বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই এসেছে দেবীর রূপ আবার প্রত্নজ্যোতির্বিজ্ঞান মতে ৪০৭৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পূজিতা রুদ্রাণীই আসলে দুর্গা। আমাদের বাংলাদেশে কবে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়েছে তা নিয়েও নানা মত। কেউ বলেন ১৪শ শতাব্দীতে বরেন্দ্রর রাজা জগদ্রাম ভাদুড়ী প্রথম মাটির মূর্তি গড়ে পুজো করেন। কেউ বলেন ১৫৮০ সালে পন্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর নির্দেশমাফিক বাংলাদেশের রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কুল্লুকভট্টের পুত্র কংসনারায়ণ রায় (চৌধুরী) প্রায় ন'লক্ষ টাকা খরচ করে মূর্তি পুজো চালু করেন আবার কারো মতে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই বাংলাদেশে ব্যাপকহারে দুর্গাপুজোর চল শুরু করেছিলেন। তাহলে মূর্তি পুজোর চল ঠিক কবে? সদুত্তর পাওয়া কঠিন, তবে একটু পিছনে তাকিয়ে দেখা যেতে পারে।

চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে সুরপাণি 'দুর্গোৎসববিবেক' পুঁথি লিখেছিলেন, একই সময় মিথিলার কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' লিখেছিলেন। এরও আগে একাদশ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ভবদেব ভট্ট মৃন্ময়ী মূর্তি পুজোর কথা লিখেছিলেন।

নবদ্বীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ১৫৬৭ সাল নাগাদ 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' লিখেছিলেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত স্মৃতিশাস্ত্রের এই পুঁথির শেষের দিকে 'শ্রীশ্রীদুর্গার্চনপদ্ধতি' দেওয়া আছে। পন্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ রঘুনন্দনকৃত 'দুর্গাপূজাতত্ত্বম' পরে আলাদা করে দু'ভাগে প্রমাণ ও প্রয়োগতত্ত্ব আকারে প্রকাশ করেন। সমসাময়িককালে শ্যামাচরণ কবিরত্ন কালিকাপুরাণোক্ত 'দুর্গাপূজাপদ্ধতি' বৈদিক মন্ত্র সহ প্রকাশ করেন। এছাড়া আর্যশাস্ত্র প্রদীপিকার লেখক যোগোত্রয়ানন্দ দুর্গার্চন ও নবরাত্র তত্ত্ব আলাদা করে লিখেছিলেন। সম্ভবত বাংলাদেশে এই বইগুলি অনুসারেই দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়। এই সব লেখাতে অনেক জায়গাতেই দেশীয় আচারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ফলে পুজো প্রকরণে কোথাও পান্তা ভাত, কোথাও শোল মাছ, কোথাও চ্যাং মাছ, আবার কোথাও থোড় কুঁড়ো, ছোলা, মটর ইত্যাদি দেবীকে ভোগ আকারে দেওয়া হয়। বলিরও রকমফের আছে - ছাগল ছাড়াও মোষ, আখ, চাল-কুমড়ো ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। কোথাও ঘটে পটে পুজো হয়, কোথাও মূর্তিপুজো হয়।

কুষ্মান্ড - নরবলীর পরিবর্তক, সেই কারণেই পূর্ববঙ্গের অনেক বাড়িতে কুষ্মান্ড খাওয়ার চল নেই। এ বঙ্গেও মেয়েদের গোটা চালকুমড়ো কাটায় নিষেধ আছে। আখ - সুরার প্রতীক, কারণ আখ থেকে গুড়, গুড় থেকে মদ বা সুরার উৎপত্তি।

একমতে দুর্গা কোকমুখা (বন্য কুকুর)। বাঁকুড়ার রায়পুরে আজও এই কোকমুখা দুর্গার পুজো হয়। মূর্তিটি পাথরের।

বাল্মীকির রামায়ণে দুর্গাপুজোর কথা নেই, কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে কিন্তু রামচন্দ্র কি মূর্তি পুজো করেছিলেন?

মহাভারতে বিরাটপর্ব ও ভীষ্মপর্বে দুর্গার স্তব আছে। আবার বনপর্বে ২২৯ অধ্যায়ে বলা আছে দুর্গা মহিষাসুর বধ করেন নি, করেছিলেন কার্ত্তিক।

সবসময় আশ্বিন মাসেই দুর্গাপুজো হয় এমন নয়। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণানবমী ও আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতেও কোন কোন জায়গায় পুজো হয়।

ভারতের উত্তরাঞ্চলে দুর্গাপুজোর বদলে নবরাত্রির উৎসব পালিত হয়। গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে নবরাত্রির সময় গর্বানাচ দেখা যায়। মনে হয় নবরাত্রি ও দশেরার উৎপত্তি তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দের কিছু পরে।

মথুরার বেরিলি জেলার মিউজিয়ামে প্রথম থেকে তৃতীয় খৃষ্টাব্দের কিছু মূর্তি রাখা আছে। এখানেই আছে রাজস্থানের নাগোর থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির সবচেয়ে প্রাচীন মহিষমর্দিনীর মূর্তি। আছে শূল নয় হাতের চাপে মহিষ বধ করছেন এমন ছয়হাতের প্রাচীন দেবীমূর্তি।

এলিফ্যান্টা গুহায় রক্ষিত মূর্তি

১৩২৯ বঙ্গাব্দে আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন ছত্তিশগড় অঞ্চলের গ্রামের কুমারীরা 'কুমারিওষা' ব্রত পালন করে। এই ব্রত ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে আরম্ভ হয় ও

আশ্বিনের শুক্লানবমীতে শেষ হয়। ১৭ দিন ধরে এই পুজো হয় এবং তাঁরা এই ১৭ দিন একবেলা খেয়ে থাকেন।

দুর্গার মূর্তিকল্পেও প্রকারভেদ দেখা যায়, দ্বিভূজা, চর্তুভূজা, অষ্টভূজা, দশভূজা ছাড়াও আঠারো হাতের দুর্গামূর্তিরও দেখা মেলে। গুপ্তযুগের কিছু মূর্তি দ্বিভূজা কিছু আবার ষড়ভূজা। রাজস্থানের উদয়গিরির মিউজিয়ামে আছে বারো হাতের দুর্গামূর্তি। মুম্বাইয়ের কাছে এলিফ্যান্টা গুহায় দেখা মেলে সপ্তম শতকের ষড়ভূজা মূর্তির। কাশ্মীরের শ্রীনগরে অশ্বারিকা দেবীর মন্দির রয়েছে। কালিকটেও দুর্গাপুজোর প্রাচীন প্রমাণ মিলেছে, দেবীর নাম তামুরণ।

বাহনেও আছে বৈচিত্র, কোথাও সিংহ, কোথাও বাঘ, কোথাও সংকর জাতীয় ঘোড়া মুখ। মূর্তি ছাড়াও পটে আঁকা দুর্গার পুজো দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে। বীরভূমের নানুরের কাছে হাটসেরান্দি গ্রামে চট্টোপাধ্যায় বাড়ির পটের দুর্গার পুজো প্রায় দুশো বছরের পুরনো। কালীঘাট পটের ও নানা গ্রামীণ পটের আঁকা ছবিতে পটুয়াদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা ও মুন্সীয়ানার পরিচয় ধরা আছে আঙ্গিকে ও বৈচিত্রে। আমাদের বাংলাদেশে দু'রকম রীতিতে দুর্গামূতি তৈরী হয়। কংসনারায়ণী রীতিতে ওপরে লক্ষ্মী-সরস্বতী, নীচে কার্ত্তিক-গণেশ। আবার বিষ্ণুপুরী রীতিতে ঠিক উল্টো, দুর্গামূর্তির ওপরের দু'পাশে কার্ত্তিক-গণেশ, নীচের দু'পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী।

ভারতে কিছু উল্লেখযোগ্য দুর্গা মন্দির রয়েছে যেমন জম্মুর কাছে কাটরায় - বৈষ্ণোদেবী, কর্ণাটকের নাগোধে - পঞ্চম শতাব্দীর মূর্তি সম্বলিত মন্দির, উড়িষ্যার ভবানীপাটনায় - মণিকেশ্বরী, কেরালার ত্রিচুরে - অম্মাথিরুভারী, রাজস্থানে - অম্বিকা মাতা, আসামের তেজপুরে - ভৈরবী দেবী, হিমাচল প্রদেশে - বালাসুন্দরী, কটকে - কটকচন্ডী, গোয়ায় - শান্তাদুর্গা, বারাণসীর কাছে - বিন্ধেশ্বরী, মহিশূরে - চামুন্ডেশ্বরী, ঘরের কাছে খড়্গপুরের অদূরে - চিলকিগড়ের কনকদুর্গা, আবার অন্ধপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায়ও কনকদুর্গার মন্দির আছে এছাড়া ভারতের বাইরে ঢাকায় আছে ঢাকেশ্বরী মন্দির। দুর্গা চন্ডী নামে বহু জায়গায় পূজিতা হন যদিও চন্ডী আসলে শিলাখন্ড এবং বহুরকম চন্ডীর নামে সারা ভারতে অসংখ্য মন্দির আছে। আমাদের হাওড়ার এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল আমতায় মেলাই চন্ডী, মাকড়দহের মাকড়চন্ডী, ঝিখিরার জয়চন্ডী ও গড়চন্ডী। বাঁকুড়ার শালতোড়ায় ঢেঁকিয়াচন্ডী, বীরভূমের পাথরায় পায়রাচন্ডী প্রমুখ।

সিংহবাহিনীর মন্দিরও বহু জায়গায় দেখা যায়। গ্রাম নাম ও স্থান নামেও দুর্গা ও চন্ডীর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কর্ণাটকের আইহোলে আছে ভারতীয় ভাষ্কর্যকলার অনুপম নিদর্শন চালুক্য বংশের দুর্গামন্দির, আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত।

বাংলাদেশের বরাবরিতে নির্মিত হত এক চালার প্রতিমা। সে রীতিতে প্রথম দুর্গা ও তাঁর ছেলে মেয়েকে আলাদা চালায় প্রতিষ্ঠা করেন যিনি তিনি ভারত বিখ্যাত শিল্পী গোপেশ্বর পাল (১৮৯৪-১৯৪৪), কুমোরঠুলি সার্ব্বজনীনের প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন গোপেশ্বর। তারপর থেকে মূর্তি গড়ার এই রীতি অনুসৃত হচ্ছে। এখন এসেছে থিমের পুজো। নানা শিল্পীর হাত ধরে বিচিত্র বর্ণের, রূপের দুর্গা শোভিত হচ্ছেন মন্ডপে মন্ডপে।

দুর্গাতত্ত্ব নিয়ে অনেক কচকচি হল। এবার আসা যাক অন্য একটি প্রসঙ্গে। এই সব প্রাচীন মূর্তির অধিকাংশই উদ্ধার হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের সময়। উৎখননের ইতিহাসও নানা বৈচিত্র ভরা। এমনই একটি নিদর্শন ধরা আছে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। উৎখননের স্থান ছোটনাগপুরের সীমান্তবর্তী এলাকার চাং ভোকর অঞ্চলের হারচোকা মন্দির। উৎখনন হয়েছিল তৎকালীন কমিশনার ক্যাপ্টেন ডব্লু. এল. স্যামুয়েলস-এর নেতৃত্বে। তিনি এই উৎখননের ছবি সহ সানুপুঙ্খ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন ঐ জার্নালে। উৎখননে পাওয়া গিয়েছিল পাথরে খোদাই করা পূর্ণাবয়ব একটি দুর্গা মূর্তি, সাপ ও ত্রিশূল সহ দুটি মহাদেবের মূর্তি, চার ফুট বাই দু'ফুট পাথরের টুকরোয় খোদাই করা পাঁচটি বিভিন্নরীতির দুর্গামূর্তি ও একটি শূলহাতে সিংহবাহিনীর মূর্তি। মূর্তিগুলি যে ৬৮৮খ্রিষ্টাব্দে নির্মীত হয়েছিল তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল একটি পাথর খোদাই লিপিতে অর্থাৎ সিংহবাহিনী দুর্গামূতির চল তখনও ছিল কিন্তু যেসব মূর্তির কথা এখানে উল্লেখিত হল সেগুলি সবই শুধুই দুর্গার মূর্তি, ছেলেপুলে কোথাও নেই। সপরিবার দুর্গাপুজোর চল কবে বা কিভাবে দুর্গা হৈমবতী উমায় রূপান্তরিত হলেন সে রহস্যের বুঝ লোক যে জান সন্ধান!

JOURNAL

OF THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

VOL. XL.

PART I. (HISTORY, LITERATURE, &c.)

(Nos. I TO III.—1871.)

এই জার্নালেই প্রকাশিত হয়েছে ক্যাপ্টেন স্যামুয়েলস-এর লেখা

Durga, ...	One image.
Mahadeo, with serpent and trident, ...	Two images.
Durga riding in 5 different fashions, ...	Slab measuring 4 feet by 2 feet.
Durga riding on a lion with spear in hand,	One image.

184 *The Rock-cut Excavations at Harchoka.* [No. 3,

Mahadeo and Parbati (Durga) seated together on a bull, ...	One image.

There were a few others which none of the people could identify.

The lower figure on pl. ix. represents the device mentioned in the Proceedings, Asiatic Society, Bengal, for 1871, p. 237.

ক্যাপ্টেন স্যামুয়েলস-এর রচনায় বর্ণিত দুর্গামূর্তির বিবরণ

বিহরে রণে কে রে বামা মৃগেন্দ্রবাহনে!

শিবেন্দু মান্না

একটা বছর পার হয়ে গেল, আবারও বড় পুজো এসে গেল। মানে, দুর্গা পুজো। বাঙ্গালীর সেরা 'শো অন দ্য আর্থ', ওরফে বর্তমানকালে জাতীয় উৎসব, আপামর বাঙ্গালীর উৎসব।

চিরকালই 'দুর্গা পূজা'-র অনুষ্ঠান অতি বৃহৎ এবং জটিল কর্ম। সুতরাং বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হতে বহু সময় লেগেছে। ব্রিটিশ শাসনকালে, বাঙ্গলার জমিদারবর্গ তাঁদের নাম খ্যাতি প্রতিপত্তি অনুসারে দেবী দুর্গার দশভূজা মূর্তি গড়ে পূজা উৎসবের এবং জৌলুস দেখানো প্রথার যে প্রচলন করেছিলেন, সেই উৎসব, ধীরে ধীরে জমিদারী-আটচালা থেকে জনগণের জনতার দরবারে উপস্থিত হয়েছে, নাম হয়েছে 'বারোয়ারী' দুর্গা পূজা।

দেবী দুর্গা সম্পর্কিত ধারণা যে কতকালের প্রাচীন তার কালাকাল নির্ণয় করা আদৌ সহজ নয়। বহু যুগের এবং বহু সমাজের, বহু জাতির ধ্যান ধারণার সম্মিলন ঘটেছে দেবী দুর্গার মূর্তির মধ্যে এবং পূজা-অর্চনার রীতি পদ্ধতির মধ্যে এবং সেই সম্মিলন ধীরে ধীরে একীভূত হয়েছে।

'দুর্গা' শব্দটির বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা হল - ''দুর-গম্ (কর্মবাচ্যে) +ড+স্ত্রীলিঙ্গে আপ - দুর্গা। 'দুর্গা' নামের ব্যাখ্যা হল - দুরাধিগম্য অর্থাৎ দেবীর স্ব-রূপ, দেবীর তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়, সাধকের জীবনব্যাপী সাধনার ধন।

বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে দুর্গা-র মূর্তি ও আরাধনা পদ্ধতি, দুর্গার তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে বহু আলোচনা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অজস্র কাহিনী, পাশাপাশি রয়েছে দেবী দুর্গা-র শত-সহস্র প্রকার নাম-মালা। এই ধরণের সূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের (রচনাকাল আনুঃ দু'হাজার খ্রি.পূর্ব কাল) বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গা-র মন্ত্র রয়েছে। অথচ প্রত্যক্ষ ভাবে 'দুর্গা' নামটি প্রথম পাওয়া যাচ্ছে, কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদ মধ্যে।

আবার পুরাণাদি গ্রন্থাদি অর্থাৎ কালিকা, দেবী, মৎস্য, মার্কন্ডেয়, অগ্নি, বৃহন্নদিকেশ্বর, যাদের রচনাকাল খ্রিস্টীয় ২য়-৩য় শতক থেকে ১১শ-১২শ শতক মধ্যে, সেগুলিতেও দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের পরিচয় মেলে। সুতরাং, ইতিহাস এবং শাস্ত্র গ্রন্থাদি বহুকাল ধরেই জড়িয়ে আছে। বাঙ্গালার মাটিতেও সেই ঐতিহ্যের কতক পরিচয় নিশ্চিত আছে। ইতিহাস সূত্রে কথিত হয় যে, বাঙ্গলার মাটিতে নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র সর্বপ্রথম দুর্গা পূজার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-র সময়কাল খ্রিস্টীয় ১৮শ শতক (জন্ম ১৭১০ খ্রি., প্রয়াণ ১৭৮৩ খ্রি.) অবশ্যই এই মত সমর্থন যোগ্য নয়। খ্রিস্টীয় ১০ম-১১শ শতকে বাঙ্গালায় যে দেবী দুর্গা (দশভূজা, অষ্টভূজা প্রভৃতি) মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল, তার 'পাথুরে প্রমাণ' রয়েছে। এখানে প্রদত্ত চিত্রে দেবী দুর্গার মূর্তিটি আজও দেখতে পাওয়া যাবে, পুরুলিয়া জেলার 'দেউলঘাটা' মৌজায়, পুরুলিয়া সদর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ কি.মি. দূরবর্তী জয়পুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম — এই জয়পুর গ্রাম থেকে আরও সাত-আট কি.মি. দক্ষিণে কংসাবতী নদীর পাড়ে বোড়াম দেউলঘাটা গ্রাম, অতীতকালের এক সুনামী তীর্থক্ষেত্র। এখানে অনেকগুলি মন্দির, কাল গর্ভে হারিয়ে গেলেও বেশ কিছু সংখ্যক মূর্তি আজও রয়ে গিয়েছে। এই সকল মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম হল অষ্টভূজা দেবী দুর্গা, এছাড়াও পার্বতী (অথবা জগদ্ধাত্রী), গণেশ, রুদ্র ভৈরব প্রভৃতি মূর্তিও আছে। আলোচ্য দেবী দুর্গা - ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষনীয় হল, দেবীর ডান-পা মহিষাসুরের কাঁধে, আর বাম পা, বাহন সিংহের উপর স্থাপিত। চিত্রখানি দেখুন অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য।

এই ধরণের সুপ্রাচীন নিদর্শন আরও কোথাও কোথাও মিলেছে। সুতরাং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, বাঙ্গালায় দুর্গাপূজার প্রবর্তক, এই তথ্য সঠিক নয়। হয়ত তিনিই সর্বপ্রথম দেবী দুর্গার দশভূজা মৃন্ময় মূর্তির পূজা প্রচলন করেছিলেন।

দুর্গা পূজা যে কালে গেলে বাঙ্গালীর হৃদয় মনকে আলোড়িত করে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে, তার একটি প্রমাণ সূত্র হল, বাংলা ১৩৫৬-৫৭ সালে মহানগর কলকাতা ও তার আশেপাশের এলাকায় দুই হাজারের বেশী দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয়েছিল, পূজিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

দেবী দুর্গা, আপামর বাঙ্গালী হিন্দুদের কাছে এমনই জনপ্রিয় যে, তিনি যেন পিতৃগৃহে আসছেন, বৎসরান্তে তিনদিনের জন্য। — এখানে লক্ষণীয় হল, দেবী পিতৃগৃহে আসছেন মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধবত অবস্থায়! আবার তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দুই পুত্র ও দুই কন্যা! স্বামী দেবাদিদেব শিব, সব কিছু নজরে রাখার জন্য এবং তিনদিন-তিন রাত্রি পার হলেই সবাইকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেবীর সঙ্গেই আছেন, তবে একটু আড়ালে আছেন। আচ্ছা, সে কি কেবল জামাই আদর কম বলেই? — জানিনা সঠিক জানা নেই। মা জননীরাই জানেন।

যা হোক, প্রশ্ন হচ্ছে, পিত্রালয়ে আগমন পথে দেবীর যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে? - সবাই বলবেন, মহিষ-অসুরের বিরুদ্ধে। আসলে, মহিষ একটা প্রাণী প্রতীক, এখানে অশুভ শক্তির প্রতীক। দেবী দুর্গা হলেন শুভকারী দেবী শক্তি। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ধারণা এই যে, দেবী দুর্গা মর্ত্যের মানুষকে এনে দেন বিজয় ও ঐশ্বর্য, আর পৃথিবী

হয়ে উঠে উর্বরা, বৃক্ষ-লতা, পত্র-পুষ্প ও শস্যে পৃথিবী হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ, ঐশ্বর্যময়ী ও নবযৌবনবতী এবং শক্তিময়ী ও অপরূপা। তাই দেবী দুর্গার আরাধনা, শরৎ ও বসন্তকালে বিধেয়। এবার তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে দেবী দুর্গার পুত্র -কন্যাগণের পরিচয় কী? - প্রকৃতপক্ষে, এঁরাও সকলেই এক এক বিশেষ প্রকার 'শক্তি'র অধিকারী। যেমন, দেবী লক্ষ্মী হলেন ধন-ঐশ্বর্য ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী, দেবী সরস্বতী হলেন বিদ্যা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী, সুপুরুষ কার্ত্তিক হলেন পৌরুষ শৌর্য-ক্ষাত্রবীর্য প্রভৃতির অধিকর্তা। আর গণেশ? — ইনি হলেন, 'গণপতি' - জনগণমন অধিনায়ক দেবতা। 'বামনপুরাণ' মতে - ইনি 'সহস্রবিঘ্নহন্তা' - এষ বিঘ্নসহস্রানি দেবাদীনা হনিষ্যতি।'' (৫৪.৭৩)।। এই কারণে সকল ক্ষেত্রে গৃহস্থরা সর্বাগ্রে গণেশকে স্মরণ করেন, - তিনি যেন সকল বিঘ্ন, সকল বিপদ দুর করে দেন। পাল সেন যুগে সম্পাদিত বিভিন্ন 'লেখমালা'য় গণেশ বণিত হয়েছেন অভীষ্ট ফলদাতা ও বিঘ্নহন্তারূপে।

যদি আজকের পৃথিবী-র পরিপ্রেক্ষিতে দেবী দুর্গার পুত্র-কন্যাদের দেখি, তাহলে কি দেখব? - ধনশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ক্ষত্রশক্তি-গণশক্তি''— এই চার চারটি শক্তিই তো পৃথিবীতে, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিকে পরিচালনা করছে। — এই প্রধান চারটি শক্তির অধিকারী, রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি, কী সর্বাধিক সফলকাম নয়? — এই ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র, সর্বপ্রকার তন্ত্র (ইজম) একাসনে, সমপংক্তিভুক্ত। আমাদের নিত্যদিনের সমাজজীবনেও একই কথা, ব্যক্তিজীবনেও তারই প্রতিফলন।

দেবী দুর্গার আরাধনায় সকল জাতির, সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের বিধি ব্যবস্থা রয়েছে। কামার-কুমোর--মালাকার-তাঁতী-তৈলকার-চর্মকার, এক্ষেত্রে কারোরই বাদ পড়ার উপায় নেই, প্রতিটি জাতিরই পূজা-ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। 'রয়েছে' মানে কিছুকাল পূর্বেও ছিল আজ, সেই ধারাটি তেমনভাবে নাই, বা -থাকলেও কতক রয়েছে। এখন অবশ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট-এর যুগ। প্রাচীন প্রথার অবসান ঘটে চলেছে। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীদের মধ্যেই একপ্রকারের 'আর্থ সামাজিক' আলোড়ন ঘটে। দুর্গাপূজা, তাই 'মহাপূজা'— সকলের, আপামর বাঙ্গালীর মহা-উৎসব, 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ'।

সকল উৎসবের একদিন সমাপ্তি ঘটে। তিনদিন আরাধনার পর 'বিজয়া', মহাপূজার অন্তিমপর্ব। এককালে বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে রেওয়াজ ছিল, বেলপাতায় লালকালি দিয়ে 'দুর্গা'- নাম লিখে দেবীপদে অঞ্জলি দেওয়ার। এই প্রাচীন প্রথার অবশেষ আজও কোথাও কোথাও রয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রাচীনকালে এই প্রথার নাম ছিল 'যাত্রা করা'। আচ্ছা, সেকি কেবল মহাদেবীর কৈলাসে নিজ আবাসের দিকে 'যাত্রা' করাকেই বোঝায়? অথবা উৎসব অন্তে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করাকেও বোঝায়? কিংবা দুই রকমই ইঙ্গিত করে থাকে?

বিজয়া দশমী। ''আমার ওই ভয় মনে, বিজয়া দশমী দিনে, / অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।।'' আমাদের চির-চেনা প্রতিদিনের পৃথিবীতে কোনও মমতাময়ী মা-জননী যেন তাঁর কন্যাকে পতিগৃহে / স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, মনের গভীরে বিচ্ছেদ যন্ত্রনা সহ্য করে এই ভাব নিয়ে কত সঙ্গীত রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

বিজয়া দশমী। —- ''এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদলবাসিনী।'' মা, কৈলাসপতির সনে 'যাত্রা' করলেন, সকলেই বলে উঠলেন, 'পুনরাগমনায় চ', - বৎসরান্তে 'আবার এসো মা'।।

দেবীর বোধন থেকে বিজয়া দশমী। প্রতি বছর, পাঁজিতে লেখা থাকে, দেবীর আগমন ..... বাহনে, দেবীর গমন ..... যোগে (বাহনে)। এই বিষয়টি নিয়ে একটি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেছেন পন্ডিত প্রবর মুরারীমোহন বেদান্তাদিতীর্থ শাস্ত্রী মহাশয়। -

'' রবৌ চন্দ্রে গজারূঢ়া রোটকে শনি ভৌমযোঃ
গুরৌ শুক্রে চ দোলাযাম বুধ বাসরে।।''

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, রবি ও সোমবার দেবীর আগমন ও প্রস্থান ঘটে 'গজ' (হস্তী) যোগে। শনি ও মঙ্গলবারে ঘোটক (অশ্ব) বাহনে। আর বুধবার নির্দিষ্ট আছে নৌকাযোগে। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে সুবিধা মত দোলা, গজ, নৌকা, - কোনও একটি বাহন। — গজে আগমন ও প্রস্থান, ফলম্ - 'শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।' ঘোটকে - 'ছত্রভঙ্গ স্তুরঙ্গম,'- ছত্রখান অবস্থা। দোলায় - 'মড়কম্ ভবেৎ' - মারী-মড়কের প্রাদুর্ভাব। আর 'নৌকা'— ফলম???—এইটি 'কুইজ'। সঠিক প্রথম উত্তরদাতা, জেলার খবর সমীক্ষা'র এককপি ''শারদীয়া সংখ্যা'' (সন ১৪২০ সাল) বিনামূল্যে পাবেন। যোগাযোগ ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর। একাধিক সঠিক উত্তরদাতা হল লটারি অনিবার্য।। উত্তর অবিলম্বে লিখিত পত্রযোগে পাঠিয়ে দিন।

অষ্টভুজা দুর্গা
খ্রিষ্টীয় ১০ম-১১শ শতক
বোড়াম,
দেউলঘাটা পুরুলিয়া
সৌজন্য ঃ
ছত্রাক,
শারদীয়া ১৩৮১,
পুরুলিয়া

ভারতের প্রাণ বায়ু ধর্ম

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবাদ আছে, গাছের গোড়া কেটে ডগায় জল। নিহিত অর্থ হল গাছের মূল কান্ড ইত্যাদি উবড়ে ফেলে অর্থাৎ তার প্রাণটি কেড়ে গাছের পাতায় শাখায় জল সিঞ্চন করলে গাছ বাঁচে না; বাঁচানর চেষ্টা ব্যর্থ। আজ স্বামীজীর জন্মের সার্ধশতবর্ষে তাঁর মূল উপদেশ ও শিক্ষা উপেক্ষা করে তাঁর জন্মবর্ষ সাড়ম্বরে পালন করাটা ঐ প্রবাদটির মূল বক্তব্যের মতো।

আমরা জানি, ভারত হল ধর্মের দেশ। বিদেশী পন্ডিতরাও বলেছেন, আমরাও প্রয়োজনে তা প্রচার করি, কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় (?) শিক্ষিত হবার কারণে স্বামীজির উপদেশ মানি না, মনে বিশ্বাসও করি না। স্বামীজি পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বলে গেছেন - ধর্ম আগে, রাজনীতি বা অন্য কিছু পরে।

Before flowing India with socialism or political ideas deluge the land with spiritual ideas. ..... If you succeed in the attempt to throw off your religion and take up either politics or society or any other thing as your centre as the vitality of your national life the result will be that you will extinct.

অর্থাৎ কিনা রাজনীতি ইত্যাদি আগে নয়, আগে চাই আধ্যাত্মিকতা, যা কিনা ভারতের প্রাণ। ধর্ম হল ভারতীয় জীবনের প্রাণপাখি। সেই ধর্মকে বাদ দিয়ে যদি সে জায়গায় অর্থাৎ জীবনের কেন্দ্র স্থলে রাজনীতি বা সমাজনীতিকে বসান যায় তবে ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে - তার অবলুপ্তি ঘটবে।

ভারত হল ধর্মের দেশ আর ইংলন্ড, আমেরিকা হল রাজনীতির দেশ। ভারতে রাজনীতির কথা বলতে হলেও ধর্মের মাধ্যমে বলতে হবে, আর ইংলন্ড আমেরিকায় ধর্মের প্রচার করতে হলে তা রাজনীতিক পদ্ধতিতে করতে হবে। ভারতবাসীর হৃদয়ে পৌঁছাতে হলে ধর্ম চাই।

তাই এ দেশে রাজনীতি চলে না। স্বামীজী তা পছন্দও করতেন না বরং ঘৃণা করতেন। তাঁর সতর্কবাণী - তোদের পার্লামেন্ট, ভোট ব্যালট দেখলাম। ..... রাজনীতির নামে চোখের জল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে যাচ্ছে। মোটা তাজা হচ্ছে ..... যে ঘুষের ধূম; যে দিনে ডাকাতি পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র। ..... দেশটা (ভারত) যে হেতু ধর্মের তাই ধর্মহীন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে এ দেশ চালান সম্ভব নয়।

এটিই হল গোড়ার কথা, ভারতকে বাঁচাতে হলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি চাই। কিন্তু স্বামীজীর সে আহ্বানে বা পরামর্শে বিংশ শতাব্দীর জননেতাগণ কর্ণপাত করেননি। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত বা বিদেশী ভাবনায় ভাবিত নেতাগণ এবং তাঁদের দেখাদেখি সাধারণ জনগণ বুঝেছেন, ধর্মই হল দেশের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক; আর জীবনের লক্ষ্য হল রাজনীতিক সাফল্য, নেতা বা মন্ত্রী হওয়া। তাই জনগণ ধর্মকে উপেক্ষা করে বিদেশী রাজনীতিকেই সমাজজীবনের কেন্দ্রস্থলে বসাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। তার ফলও স্বামীজীর কথামতো ফলতে চলেছে *the result will be that you will extinct* আমরা বিলুপ্তির মুখে।

আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও দুর্নীতিপরায়ণ দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান অন্যতম। আমাদের শাস্ত্র বলেছেন - ধর্মেণ হীনা! পশুভিঃ সমানাঃ। যার মধ্যে ধর্মবোধ নেই সে পশুর সমান। আর পশুর সমান হলেই সে দুর্নীতিপরায়ণ হয়। চুরি ডাকাতি ধর্ষণ, মিথ্যা কথন, প্রবঞ্চন ইত্যাদি সমাজের সর্বোচ্চ থেকে নিচের স্তরের মানুষের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। এর কারণ হল ধর্মের অনাদর ও রাজনীতির সমাদর। ধর্ম সত্য, প্রেম, অহিংসা, পরোপকার ইত্যাদি পবিত্র ও শুভ ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত আর রাজনীতি ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ মিথ্যা, হিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পৃথিবীর ১৭৮টি দেশের উপর সমীক্ষা করে দেখা গেছে ভারতে দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়েছে। ২০০১ সালে দুর্নীতিতে ভারতের স্থান ছিল ৭১ তম। কিন্তু ধর্মের শিথিলতায় দুর্নীতি গেছে বেড়ে। ২০১০ সালে ভারতের স্থান ছিল ৮৭ তম - গত তিন বছরে দুর্নীতি বেড়েছে ৭৪ %। কেবল আমলাদের ঘুষ দিতে খরচ হয়েছে ২১০০ কোটি টাকারও বেশি।

আর UNDP-র ১৮২টি দেশের সমীক্ষা মতো দরিদ্র ভারতের স্থান ১৩৪ তম। সবার নিচে অর্থাৎ দরিদ্রতম দেশ নাইজেরিয়া আর সবার ওপরে নরওয়ে।

স্বামীজী ধর্মের ওপর এতো জোর দেওয়া সত্ত্বেও আমরা ধর্মকে উপেক্ষা করে তাকে নিরপেক্ষ করে রেখেছি যাতে আমাদের নিত্য কাজে ধর্ম যেন হাত না বাড়াতে পারে। অথচ ধর্মই মানুষকে পবিত্র ও নিঃস্বার্থপর করে। ভালো হওয়ার ও ভালো করার নামই ধর্ম।

To be good and do good that is the whole of religion.

স্বামীজির কথায় - *Try to be pure and unselfish that is whole of religion* পবিত্র হও, নিঃস্বার্থপর হও। সেটাই ধর্ম।

বুদ্ধ থেকে যীশু, শ্রীচৈতন্য থেকে স্বামীজি সবাই বললেন - ভালোবাসো। ধর্মের সংজ্ঞা, স্বামীজির ভাষায় - *Love alone is the whole of religion.* ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ অর্থাৎ ভালোবাসার দেশ। সেই ধর্মকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ভারত বাঁচতে পারে না। স্বামীজি আসন্ন রাজনীতির পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। সমূহ বিপদের কথা স্মরণ করে সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন *The Hindu must not give up his religion* বলেছিলেন *can you become a Hindu to the very backbone in religion, culture and instincts ? This is to be done.*

ধর্মকে উপেক্ষা করলে যে সমাজের ক্ষতি হয় তা বিদেশী পন্ডিতরাও বলেছেন। পিটার ড্রাকার বলেন - সেকুলার ধর্ম থেকেই জন্ম হয় *Corruption, greed, lust for power, envy and mutual distrust, petty tyranny*। ধর্ম মানুষকে দেবত্ব দেয়, রাজনীতি দেয় আসুরিক চরিত্র যা পশুত্বের নামান্তর।

গান্ধীজীও বলেন - 'হিন্দুস্থান কদাচ নাস্তিক (সেকুলার) হতে পারে। নাস্তিকতার ভার দুঃসহ। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নেই। এই সভ্যতা অধর্ম। এই সভ্যতার রাজ্যকে শয়তানী রাজ্য বলিতে হয়। এই সভ্যতা নিজেকেও ধ্বংস করে অপরকেও ধ্বংসের পথে টানিয়া লয়'।

দুঃখের বিষয় আমরা, হিন্দুরাই নিজেদের শিক্ষিত ও আধুনিক প্রমাণ করতে সে বাণী উপেক্ষা করে, বলতে গেলে তাকে উপহাস করে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি, নিজেকে অহিন্দু প্রমাণ করতে আর তার ফলই হল এই ধ্বংস; আমরা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছি। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষ হলে চলবে না। এক নিরপেক্ষ ধর্মকে গ্রহণ করা চাই; আর সে ধর্ম হল ভারতের সনাতন ধর্ম যা সবাইকে গ্রহণ করে এসেছে।

গত একশ বছরে আমরা নিজেদের তথা ভারতের যতটা ক্ষতি করেছি তা পূরণ করতে ও ভবিষ্যতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে স্বামীজির পথই একমাত্র অনুসরণীয়। তাঁর দেড়শ' বছরের জন্ম জয়ন্তীকে সফল করতে তাঁর উপদেশ পালনই একমাত্র কর্তব্য। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ উপেক্ষা করে কেবল সভা সমিতি, প্রদর্শনী করলে বিজ্ঞজন অবশ্যই বলবেন - গোড়া কেটে ডগায় জল ঢালা হচ্ছে।

না নিবন্ধ

অঙ্কের মজা

শাশ্বত দাস

অঙ্ক আমরা সবাই করি কিন্তু অঙ্ককে অনেকেই ভয় পাই। যদিও অঙ্ক বেশ মজার। কিন্তু সেই মজাটা খুঁজে বার করতে হবে। তাহলেই অঙ্কভীতি দূর হয়ে যাবে। এখানে সেরকম কয়েকটি মজার অঙ্ক দেওয়া হল।

১. তিন অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা X ৭ X ১১ X ১৩ = ?

উঃ- ধরা যাক, তিন অঙ্কের সংখ্যাটি ৪৩৫

৪৩৫ X ৭ X ১১ X ১৩ = ৪৩৫৪৩৫

২. দুই অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা X ৩ X ৭ X ১৩ X ৩৭ = ?

উঃ ধরা যাক, দুই অঙ্কের একটি সংখ্যা ৪৯

৪৯ X ৩ X ৭ X ১৩ X ৩৭ = ৪৯৪৯৪৯

৩. পাঁচ অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা X ১১ X ৯০৯১ = ?

উঃ ধরা যাক, পাঁচ অঙ্কের সংখ্যাটি ১২৬৫৫

১২৬৫৫ X ১১ X ৯০৯১ = ১২৬৫৫১২৬৫৫

৪. ২৫৯ X আপনার বয়স X ৩৯ = ?

উঃ ধরা যাক, আপনার বয়স ১৫

২৫৯ X ১৫ X ৩৯ = ১৫১৫১৫

৫. [{(আপনার ফোন নম্বরের শেষ সংখ্যা X ২) + ৫} X ৫০] + আপনার বয়স + ৩৬৫ - ৬১৫ = ?

উঃ ধরা যাক, আপনার ফোন নম্বরের শেষ সংখ্যা হল ১ এবং আপনার বয়স ২০

[{(১ X ২) + ৫} X ৫০] + ২০ + ৩৬৫ - ৬১৫ = ১২০

উত্তরের প্রথম সংখ্যাটি হবে আপনার ফোন নম্বরের শেষ সংখ্যা এবং বাকি দুটি সংখ্যা হবে আপনার বয়স।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে কতিপয় বঙ্গনারীর প্রতিভা

(উনিশ শতক ও তার পূর্বে)

দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী

বঙ্গদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবার আগে নারীদের গৃহশিক্ষার এবং ক্ষেত্রবিশেষে চতুস্পাঠীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পাল রাজাদের সময়ে গৌড়ের বৌদ্ধভিক্ষুণী বিলাসবজ্রা বৌদ্ধ শাস্ত্র রচনা করে যশস্বিনী হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ তিব্বতে অনূদিত ও প্রচারিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এক বাঙালি পদরচয়িত্রী আছেন নাম ইন্দ্রমুখী। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে তাঁর জন্ম। ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'নীলাচলবাসিনী, গৌরাঙ্গের সমকালবর্তিনী ও শিখি মাইতির ভগিনী ছিলেন মাধবী দাস।' তিনি কিছু সময় জগন্নাথ মন্দিরের হিসাব রক্ষক ছিলেন। মহাপ্রভু পুরীধামে গেলে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত পদ আছে। কখনও কখনও 'মাধব দাস' বলে নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন। খ্রিস্টীয় ১৬৫২ অব্দে ফরিদপুর জেলার ধানুকার জগন্নাথ তর্কবাগীশের (নামান্তরে জগদানন্দ তর্কবাগীশের) কন্যা জয়ন্তী দেবী ঐ জেলার কোটালীপাড়া নিবাসী তাঁর স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমকে 'আনন্দলতিকা' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া জয়ন্তী দেবীর রচনা বলে প্রসিদ্ধ কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সংস্কৃত কবিতারও সন্ধান পাওয়া যায়।

আনন্দময়ী জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রূপসা গ্রামে। পিতা রামগতি সেন কন্যার বিদ্যাশিক্ষার তীব্র আগ্রহ দেখে তাঁর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আনন্দময়ীর বুৎপত্তি সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। একবার মহারাজা রাজবল্লভ রামগতি সেনের কাছে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রকৃতি জানতে চাইলে পিতার ব্যস্ততা হেতু কন্যা আনন্দময়ী যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি এঁকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁকে জানিয়ে দেন। মাত্র ন'বছর বয়সে (১৭৬১ খ্রি.) তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাঁর রচিত গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। পিত্রালয়ে বাসকালে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি অনুমৃতা হন ১৭৭২ খ্রি. - মাত্র কুড়ি বছর বয়সে।

অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের সোঞাইয়ের হটি বিদ্যালঙ্কার বাবার কাছে ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় পড়ে পিতা ও পতির মৃত্যুর পর কাশীধামে গিয়ে চতুষ্পাঠী খোলেন। পন্ডিতদের মতো চতুষ্পাঠীতে তিনি দক্ষিণা নিতেন এবং পন্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধেও যোগ দিতেন। তাঁর উপাধিই তাঁর বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক।

বর্ধমানের কলাইকুঠি গ্রামের নারায়ণ দাসের কন্যা রূপমঞ্জরীর পড়ার প্রবল আগ্রহ দেখে বাবা তাকে টোলে ভর্তি করে ছিলেন। সন্তান হলেই মারা যায় বলে এই মেয়ের ডাক নাম ছিল হটু। এই মেয়েও হটু বিদ্যালঙ্কার নামেই সমধিক পরিচিতা ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের চতুর্থপাদে তাঁর জন্ম বলে অনুমান করা হয়। ব্যকরণ, সাহিত্য পাঠান্তে চরক সুশ্রুত অধ্যয়ন করেন ও জটিল চিকিৎসা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি মস্তক মুণ্ডন করে টিকি রাখতেন। আমৃত্যু অবিবাহিতা থেকে তিনি অর্জিত বিদ্যা বিতরণ করে গেছেন।

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণকামিনী দাসীর রচিত 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যই প্রথম বাঙালী মহিলা কবির সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২৮.১১.১৮৫৬ তারিখে ঐ কাব্যগ্রন্থের অংশ বিশেষ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় উদ্ধৃত করে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

অনুমান ১৮৩৭ সালে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবেড়ি গ্রামে দ্রবময়ীর জন্ম। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে পিতা চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কারের কাছে দ্রবময়ী সংস্কৃত শেখেন ও ব্যকরণ কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে যশস্বিনী হন।

মেদিনীপুরের বরদা পরগণার তারিণী দেবী শিবদুর্গা বিষয়ক বঙ্গ সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর জন্ম ১৯ শতকে।

বরিশাল জেলার লাখুটিয়া গ্রামের রায়চৌধুরী পরিবারের গৃহবধূ কুসুমকুমারী দেবী ছিলেন একজন মহিলা ঔপন্যাসিক। তাঁর পুত্র দেবকুমার ছিলেন কবি ও জীবনীকার।

১৮৬১ সালে হরকুমারী দেবী 'বিদ্যাদারিদ্র্য জননী' নামক কাব্য রচনা করেন।

১৮৬৩ সালে প্রথম বাঙালী মহিলা কৈলাসবাসিনী দেবী 'হিন্দু ফিমেলস' বা 'হিন্দু মহিলাদের হীনাবস্থা' নামের গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। এটিই বাঙালি মহিলার রচতি প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

১৮৬৬ সালে 'উর্বশী' নাটক এবং ১৮৭১ সালে 'ঊষা' নাটক লিখে হাওড়ার শিবপুরের কামিনী সুন্দরী দেবী বঙ্গের প্রথম নাট্যরচয়িত্রী রূপে গণ্যা হন।

১৮০৯ সালে পাবনা জেলার পাতাজিয়া গ্রামে রাসসুন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পদ্মলোচন রায় কন্যার বারো বছর বয়সে বিবাহ দেন ফরিদপুরের রামদিয়া গ্রামে। রাসসুন্দরী ২৫ বছর বয়সের সময় নিজের ছেলের সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে থাকেন। ৫০বছর বয়সে লিখতে শেখেন। তাঁর লেখাপড়া শেখার মূলে ছিল তাঁর ধর্মপুস্তক পড়ার আগ্রহ। তিনি 'আমার জীবন' নামে গ্রন্থটি লেখেন ৫৯ বছর বয়সে ১৮৬৮ সালে। বইটিতে তাঁর জীবনের কথা যেমন

আছে তেমনই আছে পারিপার্শ্বিকতার ছবি। সেকালের সমাজ, মেয়েদের অবস্থা এবং বহু খুঁটিনাটি চিত্র বইটিতে আছে। গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁদের গৃহদেবতা মদনগোপালের উৎসবে ব্যয় করেন। ১৮৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কবি গিরীন্দ্রমোহনী দাসী ১৮৫৮ সালে কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শেখেন প্রথমে পিতৃগৃহে পিতা হারানচন্দ্র মিত্রের কাছে । ১০ বছর বয়সে বিবাহ হয় অক্রূর দত্তের বংশধর নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে। এবার স্বামীর কাছে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। বাড়িতে ছিল সেকালের বিখ্যাত 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' (১৮৭২)। ১৮৮৪ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর লেখেন 'অশ্রুকণা'। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এই গ্রন্থের কবিতা নির্বাচন করে দেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল। ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি 'জাহ্নবী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি মোট দশখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর বাংলা পদ্যানুবাদ তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল 'কবিতাহার' (১৮৭৩), 'ভারতকুসুম' (১৮৮২), 'আভাষ' (১৮৯৪), 'স্বদেশিনী' (১৯০৬) 'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭)।

প্রথম বাঙালি মহিলা মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন পাক্ষিক পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা' ১৮৭০ সালে।

১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে থাকমনি দেবী নামের একজন মহিলা মাসিকপত্র 'অনাথিনী'-র সম্পাদিকা হন।

প্রথম মুসলিম মহিলা ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর লেখা বাংলা বই 'রূপজালান' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে।

মেদিনীপুরের এক জমিদার জয়নারায়ণ সর্বাধিকারীর কন্যা কৃষ্ণভাবিনী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৪ সালে। পিতার কাছেই বাল্য শিক্ষা। আইন ব্যবসায়ী শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী বিলাত থেকে আই.সি.এস. হয়ে ফিরে এসে পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন ১৮৮২ সালে এবং সঙ্গে নিয়ে যান কৃষ্ণভাবিনীকে। সেখানকার স্ত্রী স্বাধীনতার পরিবেশে তিনি আকৃষ্ট হন। ১৮৮৫ সালে লেখেন বই 'ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা'। নিজের নাম দেন না, ছদ্মনাম দেন 'বঙ্গ মহিলা'। ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯১০ সালে 'জীবনের দৃশ্যমালা' নামক বই লেখেন। পরে তাঁর স্বামীর লেখা আত্মজীবনী 'পাগলের কথা' তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। 'ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা' বইটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেন। তিনি মোট কুড়িখানা উপন্যাস ও দু'হাজারের মতো গল্প লিখেছেন। দেশে ফিরে এসে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর বিশাল অবদান রেখে গেছেন।

'আলালের ঘরে দুলাল' প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, 'আমার জন্ম ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। আমি দেখেছি ঠাকুমা, মা, কাকিমা, জেঠিমারা বাংলা বই পড়তেন, হিসাব রাখতেন, তখন কোন বালিকা বিদ্যালয় ছিল না, মেয়েদের পড়ার মতো বইও ছিল না।'

'ঠাকুরাণী দাসী' এই ছদ্মনামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বিধবা ১৮৫৮ - ৫৯ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

১৭শ শতাব্দীর বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতী শাস্ত্রজ্ঞানী এবং সঙ্গীতে পারদর্শিনী ছিলেন। মল্লভূমের রাজা বীর হাম্বীরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্যকে তিনি স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। স্ত্রী-স্বাধীনতার দিক দিয়ে দেখলেও বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গোস্বামী বংশের তিনি আদি মাতা।

পাবনার দুর্গাদাস চৌধুরীর কন্যা প্রসন্নময়ীর জন্ম ১৮৫৭ সালে। স্বামীর নাম কৃষ্ণ কুমার বাগচী। মাত্র বারো বছর বয়সে রচনা করেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আধ-আধ-ভাষিণী'। তিনি 'মাতৃমন্দির', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখা দিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় তাঁর লেখা উপন্যাসের নাম 'অশোক'। স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'পূর্বকথা', কিশোর বয়সে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে লিখেছিলেন 'হবে নাকি এই দেশে ব্রাহ্মধর্মাচার'। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা', 'নীহারিকা'। তাঁর কন্যা সুলেখিকা প্রিয়ম্বদা দেবী, তাঁর অনুজ বিশিষ্টজনেরা হলেন আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী।

কয়েকজন মাত্র বঙ্গ নারীর আংশিক প্রতিভার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। জেলায় জেলায় অবিভক্ত বঙ্গদেশের আরও অনেকেই ছিলেন যাঁরা আপন আপন যুগের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে রেখেছিলেন — যেটা আমাদের অজানা। চলমান প্রবাহ ধারায় নারী-পুরুষ উভয়েই অবদান রেখে যেতে চান — সুযোগ অনুসারে। প্রতিভা নারী-পুরুষের কারোর কম নয়। যে-সব নারী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বুঝতে আসুবিধা হয়না, প্রতিকূলতাটা এসেছে সামাজিক দিক দিয়ে — সংসার তাকে স্বীকৃতি দিলেও সমাজ দেয়নি। তাই হয়তো তিনি নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি বা যতটা বিকশিত হবার কথা ছিল — ততটা নিজেকে প্রকাশ করতে পারেননি, তাই সে সব সৃষ্টি সহজে নজরে আসতে পারেনি।

আজ সমাজ অনেক উন্নত তাতে সন্দেহ নেই। আজ কি আশা করতে পারি, প্রতিটি বঙ্গনারী, প্রতিটি ভারতীয় নারী সমানভাবে বিকশিত হতে পারবেন, বিকাশের সুযোগ লাভ করবেন!

(তথ্যঋণঃ সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, ভারতকোষ-এর বিভিন্ন খন্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২, শ্রাবনী বসু সেন রচিত 'মধু কবিকে ভোলেনি বিলেত, কৃষ্ণভাসিনীকেও'। বাংলার মুসলমানের আটশো বছর - জাহিরুল হাসান।)

হাওড়া শহরে সঙ্গীত চর্চা ঃ সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

শ্রীসুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (Howrah District Gazetter, 1972 ed.) আক্ষেপ করছেন যে 'দৃশ্যকলা, সঙ্গীত বা নৃত্যের চর্চায় এই জেলার খ্যাতি নেই।' বাস্তবটা হল এই যে উজ্জ্বল সম্ভাবনারও বিকাশের জন্য শিক্ষা-অনুশীলন-পরিবেশগত-অনুকূলতার প্রয়োজন হয়। সাংস্কৃতিক চর্চার কতকগুলি পীঠস্থান থাকে — যেখানে গুণী সমাবেশ হয়, আর্থিক আনুকূল্য ও প্রকাশের সুযোগ থাকে, ধ্যান-ধারণা-শিক্ষার আদান প্রদান সম্ভব হয়, যেমন কলকাতা। হাওড়া যেমন কাছে থাকার জন্য সেই আলোর প্রতিফলিত আভার সুযোগ পেয়েছে, ঠিক প্রদীপের অতি নিকটত্বেই স্বীকৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অন্ধকারে থেকে গেছেন এখানকার গুণীরা। ওই Gazetter এই অমিয়বাবুর একটি অন্য মন্তব্যকে উদ্ধৃত করা যায় ''এই বিলম্বিত (বা ব্যাহত) বিকাশের অন্যতম কারণ কলকাতার নিকটত্ব''। এটা সত্য যে সুযোগের জন্য বা সুযোগ পেয়ে বেশ কিছু হাওড়ার বাসিন্দা কলকাতার শিল্পী হিসেবেই পরিচিত হয়েছেন।

হাওড়ায় বহু গুণী শিল্পী / শিক্ষক ছিলেন, আছেন; তাঁরা প্রথিতযশা শিল্পীদের দ্বারা প্রশংসিতও হয়েছেন। কিন্তু লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য বা প্রমাণের অভাবে বর্তমানে জীবিত জ্ঞানী-গুণীদের কাছ থেকে যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে তারই ভিত্তিতে এই সমীক্ষা রচিত। এটি সম্পূর্ণ বা ত্রুটিমুক্ত, এ দাবী করছি না। এটিকে একটি প্রাথমিক রূপরেখা হিসাবে গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি কয়েকজনের কিছু আলাদা পরিচিতি দিতে হয়েছে - এই শিল্পচর্চার পশ্চাতের গুরুত্ব বা গাম্ভীর্য উপলব্ধি করার জন্য।

উচ্চাঙ্গ সংগীত ঃ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া হাওড়া শহরের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে এই চর্চা প্রাধান্য পেয়েছে। শুরু করি একটি আকস্মিক ঘটনা দিয়ে। মাত্র দশ বছরের একটি বালক দুরন্ত স্বভাববশতই ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের পাশে বসে সুকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে আরোহিণী মঙ্কুবাই-কে মুগ্ধ করেছিল। পরে তাঁরই কাছে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করে যশস্বী গায়ক হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন। ইনি ঁযোগীন্দ্রনাথ বসু (১৯০১-৩৭) - কোটিরামবাবু নামে অধিক পরিচিত। তাঁর গান শোনবার জন্য ঁমন্মথনাথ গাঙ্গুলী, ঁগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীরা সমবেত হতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্মরণীয় ঁঅভয়পদ বন্দোপাধ্যায়, ঁমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু) এবং ঁঅনিল ঘোষ।

ঁমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৮৬) ঁগিরিজাশঙ্করের কাছে পরবর্তী তালিম নিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে আধ্যাত্মিক জীবন বেছে নেওয়ার পরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাদলবাবু কাসুন্দিয়ার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে আত্মনিয়োগ করেন এবং ভক্তিগীতের মধ্যেই রসাস্বাদন করতেন। তাঁর সংগীত প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন।ঁঅভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০২-৫৩)ঁগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে খেয়াল, ঠুংরি, ধ্রুপদে তালিম নেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে গভীর সঞ্চয় ও বুৎপত্তি অর্জনের পরে বাদলবাবুর প্রেরণায় তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন, সারদাগীতি, গীতা মাহাত্ম্য, কালীকীর্তন, কথামৃত মাহাত্ম্য শীর্ষক পাঁচশতাধিক ভক্তিগীতি রচনা করেন এবং যথোপযুক্ত সুরারোপ করেন। রচনাশৈলীর উৎকর্ষ এবং আরোপিত সুরের গাম্ভীর্যের জন্য তাঁর বিশাল সৃষ্টি গুণীসমাজে আদৃত হয়েছে। শিক্ষক হিসাবে তাঁর সাফল্যের পরিচয় বহন করেছেন তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যরা - শ্রীমতী নীতা সেন (বর্ধন), শ্রীমতী কৃষ্ণা দাশগুপ্ত (গাঙ্গুলী), ঁবারিদ দেববর্মণ, শ্রীশরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৎগুরুদেব), শ্রীসুশান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মায়া সরকার, শ্রীমতী বেণু মিত্র, ঁশরৎ সাতিক (বাঁশী)।

চ্যাটার্জীহাট অঞ্চলের বাসিন্দা ঁকুড়োরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মাতুলালয়ে লালিত পালিত হন। ঁদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পরে ৫ বছর ঁসতীশ চন্দ্র দত্ত (দানীবাবু)-র কাছে ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র পাল মহাশয়ের গৃহে ওস্তাদ বদল খাঁ, পন্ডিত আর. ওয়াই. মূলে (গোয়ালিয়র), গফুর খাঁ ও কে. জি. ঢেকনে-র কাছে শিক্ষালাভ করেন। পরে পন্ডিত নারায়ণ রাও ব্যাস ও পন্ডিত গুরুপ্রসাদ মিশির (টপ্পা)-এর কাছেও শিক্ষালাভ করেন। বেতারের এই নিয়মিত শিল্পী অত্যন্ত কুশলী ও সার্থক গায়ক হওয়া ছাড়াও সংগীতে স্থির চিন্তা ও গভীর শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। All India Radio-র এক বিদেশী ডিরেক্টরের বিরূপ উক্তির প্রতিবাদে ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন।

ঁগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর আর এক শিষ্য ঁরথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল ও ঠুংরি গানে রসের আবেদন ছিল নিখাদ। তাঁর শিবপুরের আবাসে বহু প্রখ্যাত শিল্পীর সমাগম ঘটেছে। পরবর্তীকালে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের পরে তাঁর ঠুংরি গানের প্রতি শ্রোতার আকর্ষণ কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বলে শোনা যায়।

কাসুন্দিয়ার ঁনীলরতন চট্টোপাধ্যায় (ফেলুবাবু) কে সংগীত শাস্ত্র ও ঘরাণার গভীর জ্ঞানের জন্য সংগীতের অভিধান বলা হ'ত। ইনি প্রথম কোটিরামবাবু এবং পরে খাদেম হোসেনের কাছে খেয়াল শিক্ষান্তে ঁরাইচাঁদ বড়ালের গৃহে গোয়ালিয়ারের রাজসভার গায়িকা মঙ্গুবাইয়ের গানে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফেলুবাবু ছিলেন একজন

সফল শিল্পী। হাওড়া শহরের বিশেষ কয়েকটি গৃহে বা স্থানে নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসতো। এর মধ্যে উল্লেখ্য শিবপুর সাজার আটচালায় ধ্রুপদীয়া অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে অনুষ্ঠিত সংগীতাসরে দানীবাবু, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কুটে গোপাল), পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রকাশবাবু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ টপ্পাগায়ক রমজান খাঁ এসেছিলেন। সালকিয়ার ঁপাঁচু অর্ণবের গৃহে খেয়াল, ঠুংরির শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের - ওস্তাদ বদল খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ থেকে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ পর্যন্ত - অনুষ্ঠান হয়েছে। সাঁত্রাগাছির ঁসুকুমার ভট্টাচার্যের গৃহেও বহু ভারতবিখ্যাত শিল্পী অনুষ্ঠান করে গেছেন। বাজেশিবপুরের ঁউত্তরা দেবীর পিত্রালয়ে নিয়মিত সঙ্গীতের আসর বসতো।

শিবপুরের অন্ধ গায়ক ঁনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (কানা নিকুঞ্জ) এক বিরল প্রতিভা। খেয়াল -ঠুংরি-টপ্পাতেও তিনি যেমন পারদর্শী ছিলেন, তবলা-বেহালা ইত্যাদিতেও তাঁর ছিল সমান দক্ষতা। শোনা যায় ঁকালীপদ পাঠক কিছুকাল নিকুঞ্জবাবুর কাছে তালিম নিয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতে হাওড়ার অন্যান্য সুপরিচিত শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - ঁভুলু সেন, ঁবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঁফণীন্দ্রনাথ নন্দী, ঁঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ফটিকবাবু), শ্রীবলাই চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এরই সঙ্গে সমান্তরালভাবে হাওড়া শহরে একটি সমৃদ্ধ বাদ্যজগৎও তৈরী হয়েছে। অনুকূলবাবুর পুত্র হীরাবাবুর যোগ্য শিষ্য ঁদক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (মোন্ডাবাবু) তালবাদ্যের ধারায় লক্ষ্ণৌ ঘরাণাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তবলার জগতে সুপরিচিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঁতুলসীচরণ পাল, ঁতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাখোয়াজে প্রবাদপুরুষ দুর্লভ ভট্টাচার্য্য ছাড়াও ঁ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঁভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঁগোবিন্দ দাস মল্লিক (ভোলাবাবু), ঁকার্ত্তিক সান্যাল, ঁবলাই ঘোষ স্মরণীয় নাম। বর্তমানে তবলার জগতে হাওড়ার প্রতিভূ হয়ে আছেন - তুলসীবাবুর পুত্র শ্রীমানিকলাল পাল ও তৎপুত্র শ্রী অসিত পাল, শ্রী সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শ্রী বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য ও তৎপুত্র শ্রী স্বরাজ ভট্টাচার্য, শ্রী বনমালী দাস, শ্রী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সরোদ বাদনে প্রথমেই উল্লেখ্য আলাউদ্দিনের শিষ্য শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম যিনি বহু আন্তর্জাতিক আসরে আমন্ত্রিত ছিলেন। অনুজপ্রতিম শ্রীকমল মল্লিকও এই সুখ্যাতির অধিকারী। শ্রী রবি লাহা বিশিষ্ট শিল্পী ও শিক্ষক। শ্রী দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অলোক লাহিড়ীর নামও উল্লেখযোগ্য।

সেতারের ক্ষেত্রে বাজেশিবপুরের ঁনৃপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (নেপাদা) শ্রীমতী কল্যাণী রায়ের গুরু, সেকালের উল্লেখযোগ্য শিল্পী। অধ্যাপক ফটিক চট্টোপাধ্যায় (পন্ডিত রবিশঙ্করের শিষ্য) শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীবিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী দিলীপ চৌধুরী প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। সন্তুর শিল্পীরূপে তরুণ ভট্টাচার্য দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন।

বাঁশি-ম্যান্ডোলিন বাদক হিসাবে শ্রী খগেন্দ্রনাথ দে এককালে সুখ্যাত ছিলেন।শ্যাম দাস, শরৎ সাতিক, অমৃতলাল রায় ও বর্তমানে শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁশিতে যথেষ্ট সুনামী। ঁ কালো সেন ক্ল্যারিওনেটে যাত্রা-নাটকের আসর মুখর করে রাখতেন। বিভিন্ন ধরণের ভারতীয় সঙ্গীতে যন্ত্র হিসেবে গীটার আজ সুপ্রচলিত। হাওড়া শহরে গীটারের শিল্পীদের মধ্যে শ্রীকুশল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅজয় দত্ত, শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায় ও শ্রী কানাইলাল রাচৌধুরীর নাম উল্লেখ্য।

শিবপুরের যন্ত্রসংগীতের ঐকতান 'কলকাকলী' এককালে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল - যার কর্ণধার ঁমতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বয়ং তিমিরবরণ উৎসাহিত করতেন।

এই সংগীত ধারার পাশাপাশি হাওড়া শহরের নৃত্যচর্চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবপুরের ঁগৌর কর্মকার পুরনো দিনের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী। উদয়শঙ্করের কৃতী ছাত্র শ্রী অচ্যুৎনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শিল্পী ও প্রশিক্ষকরূপে সেই ধারা (এমনকি ছায়ানৃত্যের মাধ্যমটিকেও) সযত্নে রক্ষা করেছেন। এই সঙ্গে শঙ্কর ঘরাণার আরেক শিল্পী শালকিয়ার শ্রীসুশীল করণের নামও উল্লেখ্য। কত্থক নৃত্যে শালকিয়ার শ্রীমতি বেলা অর্ণব এবং তরুণতর শিল্পী শিবপুরের ডঃ মালবিকা মিত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীভূপতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীশুকদেব মুখোপাধ্যায় (ঁমণি বর্ধনের শিষ্য), শ্রীবটু পাল (রবীন্দ্রভারতী), শ্রী ব্রজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বঙ্গেশ্বর মল্লিক (বর্তমানে ভূপাল গভর্নমেন্ট কলেজে নৃত্যশিক্ষক) শ্রীপ্রেমব্রত মুখোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার পরিচালক) শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি রেখা মৈত্র প্রমুখ।

টপ্পাগানে আমাদের শহরের গর্ব ঁকালীপদ পাঠকের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং তরুণতর শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় এই বিশিষ্ট ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসী। তেমনিভাবে বাংলাদেশে কীর্তন গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী এই শহরেরই ঁউত্তরা দেবী (ঘোষ) বাজে শিবপুরের ঁনিকুঞ্জবিহারী দত্তের কন্যা।

রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় সর্বাগ্রে মনে পড়ছে কবি ঁসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের (ঝন্টু দা) নাম। সাধারণ সংসারে এই অসাধারণ ব্যক্তি স্বশিক্ষিত শিল্পী - অথচ নির্ভুল তাঁর স্বরলিপি প্রয়োগ বা স্বরপ্রয়োগ। অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে অতীব দুঃখময় জীবন কাটাতে গিয়ে সাহিত্য ও গান তাঁর কাছে পাথেয় ছিল — সৃষ্টি তাঁর স্বতোৎসারিত। শিবপুরের ঁসোমেশ ঘোষ রবীন্দ্রসংগীতে আজীবন

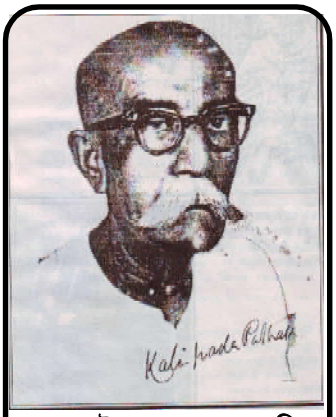

হাওড়ায় টপ্পাগানের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী কালিপদ পাঠক

নিয়োজিত ছিলেন। শালকিয়ার প্রফুল্ল ঘোষ দীর্ঘদিন আগে রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে ও প্রশিক্ষণে সম্পূর্ণভাবে যাঁরা ব্রতী তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষাল, শ্রীমতী ভারতী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী তপতী রায়, শ্রীজয়দেব বেইজ, শ্রীসৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। নজরুল গীতি চর্চায় প্রশিক্ষণে এই শহরে মগ্ন রয়েছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে নাম করতেই হবে শ্রীহরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, শ্রীশঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশান্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ডলি ঘোষালের।

আমার পাঠকবর্গকে এইটুকু নিবেদন করতে চাই যে এই লেখাটি একটি রূপরেখা মাত্র। যাঁরা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল, তাঁদেরই কয়েকজনকে বিশেষভাবে স্মরণ করলাম এই নিবন্ধে।

সম্পাদকীয় সংযোজন ঃ ডাঃ সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। সত্তোরোর্ধ এই চিকিৎসক চিকিৎসার বাইরেও নানা গুণের অধিকারী। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন যশস্বী শিল্পী, তালিম নিয়েছিলেন প্রয়াত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও টি.এল. রাণার কাছে। শিবপুর বি.ই. কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি সহ নানা বিশিষ্ট জায়গায় তিনি নানা সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। ১৯৬৯ সালে সঙ্গীত প্রবীণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশিষ্ট সমাজসেবী এই চিকিৎসক হাওড়া জেলার সঙ্গীত চর্চা বিষয়ে ১৯৮৮ সালে বাণীনিকেতন থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। হাওড়া জেলার ইতিহাস রচয়িতা অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অমূল্য এই প্রবন্ধটির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় পুর্নমুদ্রিত করা হল।

না নিবন্ধ

যাত্রাসঙ্গী

প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্মশানে এসেছিলাম। বন্ধুর দাদা মারা গেছে। মাত্রই ৪৮ বছর বয়স। হার্ট অ্যাটাক। জীবনটা স্বচ্ছ ছিল না। মদ এবং আনুসঙ্গিক সবকিছু। চরম ব্যভিচারী বলতে যা বোঝায় আর কি! অথচ স্ত্রী ও একটি করে পুত্রকন্যা বর্তমান। বলতেও লজ্জা লাগে। বন্ধুর দাদা আফটার অল! চিত্তা বহ্নিমান।

পাশের চিতাতেই শুয়ে আছে আর একজন মানুষ। মনে হয়েছিল কোন কিশোরী। কিন্তু বাড়ীর লোকের মুখে শুনলাম তার বয়স বত্রিশ। যক্ষার শিকার। স্বাভাবিক। অপুষ্টির ছাপ সারা শরীরে। দারিদ্রসীমার নীচেই সম্ভবতঃ তার অবস্থান। স্বামী কোন একটা মিলে কাজ করত। বর্তমানে ছাঁটাই হয়ে বেকার। একটি বছর সাতেকের ছেলে আছে। স্ত্রীর খাট ছুঁয়ে শূন্যদৃষ্টিতে বসে আছে। মেয়েটিকে দেখে মনে হয়, অভাগীর স্বর্গের অভাগীই যেন স্বর্গযাত্রার পথে চলেছে।

হঠাৎ শ্মশান কর্মীদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা লক্ষ্য করলাম। কয়েকজন মিলে একটা চিতা সাজানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অবাঙ্গালীদের মধ্যে যেমনটা দেখা যায় তেমনই কাঠের ওপর কাঠ সাজিয়ে উঁচু একটা চিতা তৈরি হল। ব্যাপার কি! মৃতদেহ কোথায়? শুনলাম এক 'রইস আদ্‌মির' বডি আসছে। টেলিফোনে নির্দেশ এসেছে চিতা রেডি করার। বডি এল একটু পরেই। সিনেমার নায়কের মতো দেখতে চারজন পুরুষ এক অত্যন্ত অভিজাত চেহারার বয়স্কা মহিলার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এল। সঙ্গী সাথী যারা এল সত্যিই উঁচু ঘরানার ছাপ প্রত্যেকের চোখে মুখে। খুবই গ্ল্যামারাস চেহারা সকলেরই। মৃতদেহের সঙ্গে এসেছে খান পঁচিশেক নারকেল, পনের টিন ঘি, এক ব্যাগ চন্দন কাঠ, আরও কত কি, সব দেখার অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয় নি। শ্মশানে উপস্থিত সবারই কৌতুহল এনাদেরকে নিয়ে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ভদ্রমহিলা রাজস্থানের বাসিন্দা। চার ছেলে সবাই কলকাতায় থাকে। প্রত্যেকেই নামকরা কোম্পানীতে খুব উঁচু পোষ্টে চাকরি করে। ধর্মপ্রাণ পরিবার। যিনি এসব বলছিলেন, তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনা। বললেন - এই মহিলা কত পূণ্যবতী দেখেছেন? ঈশ্বরের কত কৃপা! রাজস্থানে থাকেন। ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এখানেই মৃত্যু, ছেলে পুত্রবধূ নাতিনাতনীর হাতের জল মুখে নিয়ে। শুধু তাই নয়। রাজস্থানে তো গঙ্গা নেই। অথচ ওনার শেষকৃত্য হচ্ছে সেই গঙ্গার ধারেই।

তিনটি চিতা একসঙ্গে জ্বলছে। ভিন্ন বয়সের, ভিন্ন মানসিকতার, ভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর তিনজন মানুষ। এদের তিনজনের পাশাপাশি আসার কোন সুযোগ ছিল না। মৃত্যু তাদের পাশাপাশি তিনটি শয্যায় এনে দিল একই সাথে মহাকালের বুকে লীন হবার জন্য।

দুর্গাপুরের কিছু প্রত্ন ও পুরাবৈচিত্র

সোমনাথ রায়

দুর্গাপুর প্রধানত পরিচিত ছিল ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানসপুত্র ও ইস্পাতনগরী হিসাবে। কিন্তু ইদানিং এই ক্রমবর্ধমান শহর 'এডুকেশনাল হাব' বলেও পরিচিত লাভ করেছে। কিন্তু আরো একটি ভিন্ন কারণে দুর্গাপুর সম্প্রতি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে - বিষয়টি প্রত্নকেন্দ্রীয়। অতি সম্প্রতি অত্যাধুনিক 'সিটি সেন্টার'-এ একটি প্রাচীন সুড়ঙ্গের আকস্মিক আবিষ্কার এবং বন-ফুলঝোড় এলাকায় প্রাচীন জনপদের নিদর্শন আবিষ্কার পুরাতত্ত্বপ্রেমী, প্রত্নপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ধরণের বহু নিদর্শন কিছুদিন আগেও দুর্গাপুরে অযত্নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল - তার অনেকগুলিই অন্তর্ধান করেছে - যা কিছু বেঁচেবুচে আছে তারই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিধৃত করার প্রচেষ্টা করছি।

কুড়ুরিয়াডাঙ্গা ঃ কুড়ুরিয়া গ্রাম ও কুড়ুরিয়াডাঙ্গা 'এ জোন' স্টীল টাউনশিপের পশ্চিমে অবস্থিত। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর ''বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি''-র ৩য় খন্ডে কুড়ুরিয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ''এখানে একটি প্রস্তর নির্মিত প্যানেলে সূর্যমূর্তির নিচের অংশ আবিষ্কৃত হয়েছিল। সূর্য মূর্তিটিকে গ্রামের সর্বজনীন হরিমন্দিরে রাখা হয়েছে। এই মূর্তিটি আবিষ্কারের ফলে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে এতদঞ্চলে সূর্যপূজার প্রচলন ছিল।'' কিন্তু গ্রামে প্রথমে যে নবনির্মিত মন্দিরে পৌঁছানো গেল সেটি রক্ষাকালী মন্দির। মন্দিরটির সেবাইত শ্রী শান্তিলাল ব্যানার্জী ও তাঁর ভাই বাপন ব্যানার্জী। এই জায়গাতে আগে একটি দালান মন্দির ছিল। এখন সেখানে ঝাঁ চকচকে মন্দির, গ্রীলের গেট, মার্বেল পাথরের মেঝে। কচ্ছপের খোলের আকৃতির একটি পাথর দুটি মাঝারি আকারের মাটির ঘোড়ার মাঝে একটি মার্বেলের বেদির ওপর সিঁদুরচর্চিত অবস্থায় ন্যস্ত আছে। পাথরটি সূর্যমূর্তির পেডেস্টাল না হেলমেট কি রূপে শোভিত হত তা বোঝা শিবেরও অসাধ্য - সব লাল হো গিয়া! পাথরটি লম্বায় ১'৪" এবং চওড়ায় ১', মাঝের টিবি অংশটি ৮" উঁচু।

যমুনাময়ী আশ্রম ঃ রক্ষাকালী মন্দিরের কাছে যে সব ছেলেগুলি কালভার্টে বসে আড্ডা দিচ্ছিল তাদের কাছেই জানা গেল যে গ্রামের ভেতরে যমুনাময়ী আশ্রমে এবং কুড়ুরিয়া কালকেতলা ডাঙ্গাতে একটি করে শিলাখন্ড আছে। যমুনাময়ী আশ্রম যাওয়ার রাস্তায় একজন ইতিহাসপ্রেমী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল, তিনিও সূর্যমূর্তির ব্যাপারে কিছু জানেন না কিন্তু যমুনা আশ্রমে শিলাখন্ডের উপস্থিতির কথা সমর্থন করলেন। তথাকথিত ভদ্রলোকের পাড়া থেকে অনেক দূরে নিচুশ্রেণীর মানুষদের বাসস্থানের ভেতরে যমুনাময়ী আশ্রম। প্রচুর গাছের ভেতর কয়েকটি পাকা ও দু'য়েকটি মাটির বাড়ি উঁকি দিচ্ছে। বাঁশের বাতার গেট খুলে দু'জনে ভেতরে ঢুকলাম - গোটা আশ্রমটি বড় বড় গাছে ভর্তি, গাছেরতলা এবং মন্দির ঝকঝকে পরিস্কার। নতুন মন্দিরে আমাদের কোন আকর্ষণ নেই, একটি বটগাছের মোটা মোটা ঝুরিগুলির মাঝে একটি বড়সড় মাকড়া পাথরের খন্ডের ওপর রাখা শিলা খন্ডটির দিকে এগিয়ে গেলাম। একেবারে সঠিক বলা সম্ভব নয়, কিন্তু এই পাথরের খন্ডটিকে কোন প্রাচীন মন্দিরের আমলক শিলা অথবা পদ্মবেদীর অর্ধেক অংশ বলে মনে হল। খুব সম্ভবত প্রাচীনযুগে এখানে এক বা একাধিক মন্দির ছিল যেখান থেকে সামান্য কয়েকটি ভগ্নাংশ বিভিন্ন মন্দির বা থানে পূজিত হচ্ছে। বটতলার শিলাখন্ডটি মা ষষ্ঠী এবং আশ্রম প্রাঙ্গণে মার্বেল টালির ওপর সিঁদুর মাখানো পাথরটি মা যমুনাময়ী রূপে পূজিত হচ্ছে। এগুলি দেখার সময় আশ্রমের রূপকার শ্রী বিজন মন্ডল এলেন। অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ, জানালেন তাঁর দাদা মোহন মন্ডলও এই আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণে নিবেদিত প্রাণ। ৫ই মাঘ আশ্রমে প্রতি বছর মহারুদ্র যজ্ঞ হয় মহাসমারোহে, প্রচুর জনসমাগম হয় এই খবর জানিয়ে বিজনবাবু অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সেই সময়ে আসার বারবার আমন্ত্রণ জানালেন। শহুরে ভদ্রতায় তাঁকে স্তোক দিয়ে আবার দ্বিচক্রযানে চেপে বসা। পরবর্তী গন্তব্য পিছনে ফেলে আসা একটি শিব মন্দির। গিয়ে দাঁড়াতেই বিভিন্ন বয়সের কৌতুহলী লোকজন আড্ডা ছেড়ে, দোকানদানি ছেড়ে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

খগেশ্বর শিব মন্দির ঃ তাঁদের কৌতুহল সংক্ষেপে মেটানোর পর পাল্টা প্রশ্ন করে জানা গেল মন্দিরটি খগেশ্বর শিব মন্দির বলে পরিচিত। স্বপন সামন্ত আরো জানালেন যে নায়েক পরিবার, মন্ডল পরিবার এবং পাল পরিবার পালা করে নিত্যপূজা চালান। মন্দিরটি একটি রেখ-দেউল, কিন্তু এটির গঠনে বিশিষ্টতা আছে। মন্দিরটির গঠন শৈলী ওড়িশি শৈলীর রেখ-দেউল বা শিখর - দেউলের গঠন রীতিকে আংশিক ভাবে অনুসরণ করলেও সম্পূর্ণভাবে কপি করা হয়নি। মন্দিরটিতে 'পিষ্ট' বা 'তলপত্তন',

নৃত্যরত শিব

'পাভাগ', 'তল জাঙ্ঘ' ও 'বন্ধনা' পর্যন্ত ক্রম অনুসারে এবং সঠিক অনুপাতে তৈরী হয়েছে কিন্তু 'উপরের জাঙ্ঘ' অংশটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ, মন্দিরটির মোট উচ্চতার অর্ধেকাংশেরও বেশি। তুলনায় 'বরন্ড' সঙ্কুচিত এবং 'গন্ডী' অংশটি দীর্ঘাকৃতি হওয়ার বদলে প্রায় অর্দ্ধগোলকের চেহারা নিয়েছে। মন্দিরটির 'মস্তক' অংশটি পরবর্তীকালে সংস্কার হওয়ার ফলে বেমানান একটি সংযোজনে পরিণত হয়েছে এবং 'মস্তকে'র চারটি ভাগ - 'বেঁকি', 'আমলা', 'খুপরি' এবং 'কলস' একই আকৃতির হয়ে গেছে। মন্দিরটির 'গন্ডী'অংশে একটি অত্যন্ত চওড়া 'রাহাপগ' এবং মানানসই 'অনুরথ পগ' থাকার ফলে গন্ডী অংশটিকে পদ্মের আকৃতি এনে দিয়েছে। মন্দিরটিতে বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, সংস্কার পূর্ববর্তী সময়ে ছিল কিনা এবং মন্দিরটির শেষ অংশ সংস্কার কবে হয়েছে - স্থানীয় মানুষরা কেউ জানেন না। তবে তাঁদের অনুমান মন্দিরটিতে টেরাকোটার কাজ ছিল। আশেপাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মাকড়া পাথর বা ল্যাটেরাইটের ব্লক থাকলেও মন্দিরটি কিসের তৈরী তা বোঝা যায়নি। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা যথাক্রমে ৮'১১"X১০'X২৫'। গর্ভগৃহে দুটি শিবলিঙ্গ বর্তমান। মন্দিরটির অনতিদূরে একটি গৌরাঙ্গের মন্দির রয়েছে, যেটি আগে একটি মাটির ঘর ছিল। এখানে গৌরনিতাই-র উর্দ্ধবাহু মাটির মূর্তির নিত্যসেবা হয়। সেবাইৎরা হলেন নিমাই মন্ডল এবং বৈদ্যনাথ অধিকারীর পরিবার। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন তমাল বৃক্ষ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আড়া ঃ কাঁকসা থানার অন্তর্ভুক্ত আড়া গ্রামটি (জে.এল.নং ৯১) প্রাচীনত্বের দিক থেকে শুধু দুর্গাপুরের নয় সারা বংলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই আড়া গ্রামে যাবার জন্য কুড়রিয়া গ্রাম থেকে আড়াআড়ি স্টিল টাউনশিপের এ জোন, বি জোন পেরিয়ে বিধাননগর, সেপকো, কালীগঞ্জের ওপর দিয়ে গিয়ে এন.এস.হোটেল ম্যানেজমেন্ট আকাদেমীর পাশ দিয়ে প্রথমে আড়া শিবতলায় পৌঁছালাম। পয়লা জানুয়ারীর ভিড় শুরু হয়ে গেছে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে রাঢেশ্বর শিবের মন্দির। দুর্গাপুর-শিবপুর রাস্তার মুচিপাড়া থেকে মাত্র ২.৫ কি.মি. উত্তরে এর অবস্থান। অপরদিকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় ''জয়দেব কেন্দুলী হতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণস্থিত আড়া গ্রামই প্রাচীন রাঢ়াপুরীর স্মৃতি বহন করছে''(গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, পৃ.২৮)।

রাঢেশ্বর শিবের মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে রুটিন মাফিক মন্দিরের পরিচয় জ্ঞাপক দু'টি বোর্ড লাগানো আছে - একটি ইংরাজীতে এবং অন্যটি বাংলা ভাষায়। বাংলা বোর্ডটিতে লেখা আছে -

বীরভানপুরে প্রাপ্ত সূর্য ও বিষ্ণুর মূর্তি

রাড়েশ্বর শিবমন্দির

নগর শৈলীতে মাকড়া পাথর ও বেলে পাথরে নির্মিত এই রাড়েশ্বর শিবমন্দির গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিশাল শিবলিঙ্গের জন্য বিখ্যাত। প্রারম্ভিক পর্বে চুনের পলেস্তারায় আবৃত আনুমানিক দ্বাদশ শতকে নির্মিত এই মন্দিরটির বর্হিভাগে বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সপ্তরথ মন্দিরটির মূল বৈশিষ্ট্য হইল ইহার শিখর ভাগ যাহার বর্হিগাত্র এই অঞ্চলের সমসাময়িক মন্দিরগুলির ন্যায় গোলাকার না হইয়া তীক্ষ্ণ।

যখন বিশেষজ্ঞদের মতে রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরটি পঞ্চদশ শতকে নির্মিত বলে মনে করা হয় তখন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এটিকে 'আনুমানিক দ্বাদশ শতকে নির্মিত' বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন কিভাবে তা বোধগম্য হয়না।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটুকু আলোচনাই করা গেল বাকি অংশ পরে দেখা যাবে।

শিশুমনের আয়নায় -

স্কেচ ঃ দিতি হাজরা, ষষ্ঠ শ্রেণী

শতবর্ষে ভারতীয় চলচ্চিত্র

জহর চট্টোপাধ্যায়

১৯১৩ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হলেও চলচ্চিত্রকে নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৮৯৬ সাল থেকেই। সে বছর ৭ জুলাই বোম্বের ওয়াটসন হোটেলে লুইস ও অগুস্ত লুমিয়ার তাদের

তৈরী চলচ্চিত্রের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সেই প্রদর্শনীতে লুমিয়ার ভাইরা তাঁদের তৈরী পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর চলমান ছবি পর্দায় দেখান। ৭ জুলাইয়ের 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এই প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। এটিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম বিজ্ঞাপন। ঐ বিজ্ঞাপনের বয়ানে লেখা ছিল 'Living Photographic pictures in life-size reproductions by Messrs Lumiere Brotheres.' আজ তো সমস্ত ভারতীয় সংবাদপত্রে চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন ছাপার জন্যই আলাদা একখানা পাতা থাকে। অনেকের কাছেই খবরের কাগজের প্রধান আকর্ষণ এই 'সিনেমার পাতা।' চলচ্চিত্র বা তার জনপ্রিয় নাম সিনেমা'র সঙ্গে ভারতবাসী তথা বাঙালির যেন নাড়ির টান। বাঙালির কাছে সিনেমা তার ঘরেরই আর এক সদস্যের মতো। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও সে অনায়াসে ঢুকে পরতে পারে, রাগ-অভিমান থেকে মানভঞ্জন পর্যন্ত করাতে পারে। নবদম্পতিকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি ঝেঁটিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার রেওয়াজটা আগের মতো না হলেও কমবেশী এখনও চোখে পরবে। বাঙালির 'উইকএণ্ড আউটিং'এর তালিকায় সিনেমা আজকের দিনেও সেরা বাছাই। বাঙালির মতোই সিনেমা নিয়ে উন্মাদনা দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে। রুপোলি পর্দার অভিনেতা-অভিনেত্রী'র বিশাল বিশাল 'কাটআউট' গুলোই বুঝিয়ে দেয় সিনেমা তাদের কাছে বেঁচে থাকার একটা উপকরণ, জীবনের সঙ্গে তারা সিনেমাকে জড়িয়ে ফেলেছে। তাই রজনিকান্তের ছবি দেখতে আসা ভিড়ের ঠেলা সামলাতে ভোর পাঁচটা থেকে হলমালিকরা সিনেমার শো শুরু করতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকের কাছে এ সব পাগলামো মনে হলেও বাঙালিরও এমন নমুনা আছে। বেশ কিছু বছর আগে 'বেদের মেয়ে জোস্না' ছবি নিয়ে

এমন পাগলামো দেখা গিয়েছিল বাংলার গ্রামে গঞ্জে। শহরের হলগুলোতে ও 'হাউসফুল' লেখা বিলুপ্তপ্রায় বোর্ড ঝুলতো প্রতিটি শোয়ে। শুধু এই সিনেমাটা দেখার জন্যেই গ্রাম থেকে অনেক লোক শহরের হলগুলোয় ভিড় করতেন এ কথা সত্যি হলেও শহরের লোকেরাও যে ছবিটা ভিড় করে দেখছিলেন এটাও সত্যি। সাম্প্রতিককালে আবার সেই একই ছবি দেখা গেছে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবিটির জন্য। এই আবেগ, ভালোবাসা বোধহয় ঐ সিনেমা নামে 'মা' ডাকটার জন্যে। অবশ্য সিনেমা নিয়ে বাঙালির গর্ব করা সাজে, তার কারণ অনেক থাকলেও একা সত্যজিৎ রায়ই একটা বড় কারণ।

ইতিহাস হাতড়ে দেখা যাচ্ছে হরিশ্চন্দ্র সখারাম ভাটভাদেকর হলেন প্রথম ভারতীয় সিনেমাচিত্রগ্রাহক, অর্থাৎ 'সিনেমাটোগ্রাফার'। তিনি সাভে দাদা নামে পরিচিত ছিলেন। পেশায় ছিলেন চিত্রগ্রাহক। ১৮৮০তে তিনি বোম্বেতে একটা স্টুডিও খুলেছিলেন। ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাইয়ের লুমিয়ার ভাইদের চলমান চিত্রের সেই প্রদর্শনে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। লুমিয়ার ভাইদের কাজে তিনি এতটাই প্রভাবিত হন যে ১৮৯৯ সালে ২১টি গিনি খরচ করে লণ্ডন থেকে একটি 'মুভি ক্যামেরা' আনান। সেই বছর নভেম্বর মাসে ঐ 'ক্যামেরা' দিয়ে দুই পালোয়ানের কুস্তির ছবি তোলেন। বোম্বাইয়ের হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে পুণ্ডলিক এবং কৃষ্ণ নাভি নামে দুই পালোয়ান কুস্তিগীরের লড়াইয়ের যে ছবি সেদিন তিনি বানিয়ে ছিলেন সেটিই ভারতের প্রথম চলমান চিত্র। ছবি তোলার পর তা লণ্ডনে পাঠানো হয় 'প্রসেসিং' করতে। ছবি দেখানোর জন্য সাভে দাদা একটা 'প্রজে*টার' কিনে ফেলেন। তাঁর তোলা দ্বিতীয় ছবিটি ছিল 'মাদারি কা খেল' মানে বাঁদর খেলা। এক সার্কাসের তাঁবুতে গিয়ে বাঁদরের কসরৎ তিনি ক্যামেরা বন্দী করেন। এই সব ছবি তিনি মহারাষ্ট্রের গ্রামে গঞ্জে দেখিয়ে বেড়াতেন।

এই পেশা তাঁকে একই সঙ্গে সুনাম ও আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়। তাঁর এলাকার নানান দৃশ্য এবং ঘটনা তিনি ক্যামেরা বন্দী করতেন। ১৯০১ সালে কেমব্রিজ থেকে ভারতে ফেরেন বিখ্যাত গণিতবিদ আর. পি. পারঞ্জপে। সাভে দাদা তার জাহাজে করে বোম্বে ফেরার, জাহাজ থেকে নামার ছবি তোলেন। এটিই ভারতের প্রথম সংবাদ চিত্র। ১৯০৩ সালে দিল্লীর দরবার হলের এবং রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে কলকাতায় গিয়ে লর্ড কার্জনের ছবিও তিনি তুলেছিলেন। এগুলি সবই বাস্তব ঘটনার ছবি বা 'ডকু ছবি'। সাভে দাদা কোনো কাহিনি চিত্র নির্মান করেননি। ১৯৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৯৬ সালে লুমিয়র ভাইদের সেই চলচ্চিত্র প্রদর্শন ছিল কয়েকটি চলমান ছবির প্রদর্শন, পরবর্ত্তীকালে সাভে দাদা এই ধরনের ছবি তৈরী করতেন। ভারতে প্রথম কাহিনিচিত্র দেখানো হয় ১৮৯৮ সালে, কলকাতায়। কলকাতার স্টার থিয়েটারে প্রফেসর স্টিফেনসন নামে এক বিদেশী চিত্রগ্রাহকের তোলা ইংরেজদের ভারতবাসের নানা ঘটনা নিয়ে 'Panorama of Calcutta' নামের ছবিটি দেখানো হয়। এই ছবি দেখে অনুপ্রণিত হয়ে ১৯০১ সালে হীরালাল সেন কলকাতায় ছবি তৈরী শুরু করেন। তিনি মুলত মঞ্চের নাটকগুলির ছবি তুলতেন। নির্বাক সেই সব ছবিতে সম্পূর্ণ কাহিনি ধরা থাকতো, তাই তিনিই হলেন ভারতের প্রথম কাহিনিচিত্রকার। ১৮৬৬ সালে বর্তমান বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের বাজুরি গ্রামে হিরালাল সেনের জন্ম হয়। জমিদার বংশের এবং সফল আইনজীবীর সন্তান হয়েও তিনি অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। হীরালাল ১৮৯৮ সালে স্টার থিয়েটারে 'ফ্লাওয়ার অফ পার্সিয়া' নাটকে অভিনয় করতেন। সেই সময় প্যারিস থেকে আসা একটি দল প্রফেসর স্টিভেনসনের 'Panorama of Calcutta' নামের স্বল্পদৈর্ঘের ছবিটি 'ফ্লাওয়ার অফ পার্সিয়া' নাটকের সঙ্গে দেখায়। ছবি দেখে হিরালাল এক নতুন দিশা খুঁজে পান। ভাই মতিলাল

সেনের সহায়তায় লণ্ডনের বিখ্যাত 'ওয়াবউইক কোম্পানি' থেকে চার্লস আরবানের তৈরী 'আরবান বায়োস্কোপ' কলকাতায় আনান। তিনি 'ফ্লাওয়ার অফ পার্সিয়া' নাটকের একটি নাচের দৃশ্যের ছবি তোলেন। এরপর দুই ভাই মিলে 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানী' তৈরী করেন। ১৯০১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত হীরালাল সেন চল্লিশটি কাহিনিচিত্র নির্মান করেন। এর মধ্যে বেশীরভাগই ছিল 'অমরেন্দ্র দত্ত নাট্য কোম্পানী' পরিবেশিত নাটকের চলচ্চিত্রায়িত রূপ। তাঁর তৈরী কাহিনিচিত্রগুলির মধ্যে ১৯০৩ সালে তৈরী 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর' ছবিটি ছিল সব থেকে দীর্ঘ। হীরালাল সেন শুধু ভারতের প্রথম কাহিনিচিত্রকারই নন, ভারতের প্রথম বিজ্ঞাপন চিত্রেরও নির্মাতা। কাহিনিচিত্র বানানোর পাশাপাশি কমিশনের ভিত্তিতে তিনি বিজ্ঞাপনের ছবি বানাতেন। 'জবাকুসুম তেল' ও 'এডওয়ার্ডস টনিক' এই দুই পণ্যের বিজ্ঞাপন চিত্র তিনি তৈরী করেছিলেন এ তথ্য পাওয়া গেছে। ১৯০৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার ট্যউন হলে 'স্বদেশী আন্দোলন' হীরালাল সেনের তৈরী একটি ছবি দেখানো হয়। ছবির শেষে 'বন্দেমাতরম' কথাটি ছিল। এটিকে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র বলে চিত্র সমালোচকরা চিহ্নিত করেছেন। 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানী' নাম দিয়ে একের পর এক ছবি তৈরী করলেও তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকে। ১৯১৩ সালের পর তিনি ছবি তৈরী বন্ধ করে দেন। এই সময় তাঁর ক্যান্সার ধরা পরে এবং ১৯১৭ সালে মারা যান। তার থেকেও দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তাঁর তৈরী সমস্ত ছবি ছাই হয়ে যায়।

১৯০২ সালে জামসেদজি ফ্রামজি ম্যাডান কলকাতায় ছবি দেকানোর ব্যবসা শুরু করেন। কলকাতা ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে এবং কোরেন্থিয়ান থিয়েটারে তিনি ছবি দেখাতেন। তিনি 'এলফিনস্টোন বায়োস্কেপ কোম্পানী' তৈরী করে প্যারিসের 'প্যাথে ফ্রেয়ার্স'

কোম্পানীর জিনিসপত্রের সাহায্যে 'প্যাথে প্রেডাকশনস্' নির্মিত ছবি দেখাতেন। ঐ বছরই তিনি অ্যালফ্রেড থিয়েটারে ছবি দেখানো শুরু করেন এবং কয়েক দিন পরে থিয়েটারটিই কিনে নেন। ১৯০৭ সালে তিনি কলকাতার প্রথম স্থায়ী চলচ্চিত্র প্রদর্শন কেন্দ্র 'এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস' নির্মান করেন, যেটি এখন 'চ্যাপলিন' নামে পরিচিত। এরপর তিনি 'ম্যাডান থিয়েটার' এবং 'প্যালেস অফ ভ্যারাইটি' নামে আরো দুটি হল নির্মান করেন। 'প্যালেস অফ ভ্যারাইটি' এখনকার 'এলিট সিনেমা'। ১৯১৯ সালে গঠিত হয় 'ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড'। ঐ বছর ম্যাডান থিয়েটার বাংলার প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'বিল্বমঙ্গল' নির্মান করে যা 'কর্ণওয়ালিস থিয়েটার' অর্থাৎ আজকের শ্রী সিনেমায় মুক্তি পায়। 'ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড' কলকাতায় আরো অনেকগুলি সিনেমা হল তৈরী করে, যেমন 'দ্য ইলেকট্রিক থিয়েটার', 'গ্র্যান্ড অপেরা থিয়েটার', 'ক্রাউন সিনেমা'। এই হল গুলি আজও টিকে আছে, তবে নাম বদলে। যেমন, 'দ্য ইলেকট্রিক থিয়েটার' বর্তমানের রিগ্যাল সিনেমা, 'গ্র্যান্ড অপেরা থিয়েটার' আজকের গ্লোব আর 'ক্রাউন সিনেমা' হল আজকের উত্তরা সিনেমা। ম্যাডান তাঁর কোম্পানীর ছবিগুলিকে সেরা মানের করার জন্য বিদেশী কলাকুশলী ও অভিনেতাকে নিয়োগ করে ছিলেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৩, এইসব বিদেশী কলাকুশলীদের দিয়ে ম্যাডান নল দময়ন্তী, ধ্রুব চরিত্র, রত্নাবলী এবং সাবিত্রী-সত্যবান নামে প্রতি বছর একটি করে পৌরাণিক ছবি করান। এইসব ছবির অভিনেত্রী পেসেন্স কুপার হলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম স্টার। ম্যাডানই প্রথম ছবি তৈরীর জন্য বিখাত লেখকদের কাছ থেকে গ্রন্থস্বত্ব কেনেন। ম্যাডান বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প অবলম্বনে বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী ও রাধারাণী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে গিরিবালা ছবি বানান।

১৯১২ সালে ইংল্যাণ্ডের ওয়ালটনে বিখ্যাত প্রযোজক সিসিল হেপওয়ার্থের কাছ থেকে চলচ্চিত্র নির্মানের নানা বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে ধুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে দেশে ফেরেন। 'লাইফ অফ ক্রাইস্ট' ছবিটি দেখে ফালকে ভারতীয় দেবদেবীদের নিয়ে ছবি করার কথা ভাবেন। ঐ বছর নিজের চলচ্চিত্র নির্মানের জ্ঞানকে কাজে

লাগিয়ে ফালকে ভারতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' নির্মান করেন। বম্বের করোনেশন সিনেমাটোগ্রাফ হলে ১৯১৩ সালের ৩ মে তারিখে ছবিটি মুক্তি পায়। এই ছবিতে হরিশচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন দত্তারায়া দামোদর দাভকে এবং তারামতী'র ভূমিকায় কোনো মহিলা অভিনয় করেননি, করেছিল সালুঙ্কে নামে এক কিশোর। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম নায়িকা হলেন কমলা, তিনি ফালকের দ্বিতীয় ছবি 'মোহিনি ভষ্মাসুর' ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯১২ সালে বম্বেতে রামচন্দ্র গোপাল 'পুণ্ডরীক' নামে একটি নাটককে ক্যামেরা বন্দী করেন এবং এটিও করোনেশন সিনেমাটোগ্রাফ হলে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এই ছবির ক্যামেরা চালিয়েছিলেন একজন ইংরেজ। সে দিক থেকে 'রাজা হরিশচন্দ্র' হল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারা তৈরী করা ছবি। তাই ধুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে বা দাদাসাহেব ফালকে হলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক। 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছাড়াও ফালকে 'কৃষ্ণ জন্ম', 'কালীয় দমন', 'সেতুবন্ধন', 'গঙ্গাবতরণ', 'মোহিনি ভষ্মাসুর', 'সাবিত্রী-সত্যবান' ইত্যাদি ছবি তৈরী করেন। ফালকের 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছবিটি ১৯১৪ সালে লণ্ডনে দেখানো হয়। এটিই বিদেশে প্রদর্শিত প্রথম ভারতীয় ছবি।

১৯২০ সালে বাবু রাও পেন্টার তাঁর ছবির প্রচারের জন্য পোস্টার নির্মাণ করেন। 'বস্ত্র-হরণ' ছবির জন্য কার পোস্টারটিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম পোস্টার। ১৯২৬ সালে বেগম ফতিমা সুলতানা ছবিতে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনার কাজও শুরু করেন। তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা চলচ্চিত্র পরিচালিকা। তাঁর পরিচালিত ছবি গুলির মধ্যে ছিল 'বুলবুলে পরিস্তান', 'গডেস্ অফ লাক', 'চন্দ্রাবতী',

'মিলন দীনার'। তাঁর কন্যা জুবেইদা ভারতের প্রথম সবাকচিত্র 'আলম আরা' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২৭ সালে সারদা ফিল্ম কোম্পানীর 'প্রিজনার অফ লভ' ছবিতে প্রথম বারের জন্য একই অভিনেতাকে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যায়। ঐ ছবিতে মাস্টার বিট্‌ঠল দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯২৯ সালে কলকাতার ম্যাডান কোম্পানী আমেরিকা থেকে টকি দেখাবার যন্ত্রপাতি নিয়ে আসে এবং 'এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস' হলে দু'রিলের টকি দেখানো শুরু করে। এই হলে দেখানো উইনিভর্সালের 'মেলোডি অফ লভ' নামের ইংরেজী ছবিটি হল ভারতে প্রদর্শিত প্রথম টকি। ১৯৩১ সালে তৈরী হয় ভারতের প্রথম টকি 'আলম আরা'। এর আগে কলকাতার ম্যাডান কোম্পানী ও বোম্বের কৃষ্ণ ফিল্ম কোম্পানী কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের টকি তৈরী করে। আর্দেশির এম. ইরানী তাঁর ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানী'র ব্যানারে 'আলম আরা' নির্মান কবেন। ছবিটি ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ তারিখে বম্বে'র ম্যাজেস্টিক সিনেমা হলে মুক্তি পায়। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সারা ফেলে দেয় এই ছবি। মানুষের মধ্যে এমন উন্মাদনা সৃষ্টি হয় যে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সিনেমা হলগুলিতে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। ছবিতে সাতটি গান ছিল, তার মধ্যে ওয়াজির মহম্মদ খানের গাওয়া 'দে দে খুদাকে নাম পে দে দে' গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। তখন প্লে-ব্যাক ছিল না বলে ওয়াজিরকে ফকিরের চরিত্রে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই গানটি গাইতে হয়েছিল। নায়িকা জুবেইদার কণ্ঠে ছিল 'বদলা দিলায়েগা ইয়ে রব'। এছাড়া অন্য গানগুলি হল 'তেরি কাতিল নিগাহোঁ নে মারা', 'রুঠা হ্যায় আসমা', 'দে দিল কো আরাম', 'ভর ভরকে জাম পিলা', 'দরশ বিনা মারে হ্যায় তরসে ন্যয়ন'। আমাদের দুর্ভাগ্য যে২০০৩ সালে পুণের ন্যাশানাল ফিল্ম আর্কাইভে আগুন লেগে 'আলম আরা', 'অচ্ছুত কন্যা', 'রাজা হরিশচন্দ্র'র মত ছবি গুলির আসল প্রিন্টগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই 'আলম আরা'র গান শোনার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। শুধু কয়েকটি স্থিরচিত্র ছবির স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে। এই ছবি থেকেই শুরু হল ভারতীয় ফিল্মী সঙ্গীতের এক বিশেষ ধারা, যার হাত ধরে আজও সৃষ্টি হয়ে চলেছে অসম্ভব ভালোলাগা সব গান আর আবির্ভাব ঘটে চলেছে বিচিত্র প্রতিভাধর সব শিল্পীদের। ঐ বছরই বাংলা ভাষায় পূর্ণদৈর্ঘের প্রথম টকি তৈরী করে ম্যাডান কোম্পানী। ছবির নাম 'জামাইষষ্টি'।

খেলার দুনিয়া

হায় ! অলিম্পিক

রাজকুমার মন্ডল

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। সত্যিই বিচিত্র। ৮০ বৎসরের অলিম্পিক ইতিহাসে মাত্র ১২টি সোনা। জনসংখ্যাও অবাক করার মতো ১২২ কোটিতে। তবু ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিকে আরও পাঁচটি পদক যোগ হয়েছে। একক ভাবে সোনার সংখ্যা ছিলো ৭টি। আশা জাগিয়েছিলেন অনেকেই। অলিম্পিকে যাওয়ার আগে দুর্বার মন্তব্য। সোনা জিতে ওড়াবো ভারতের জাতীয় ধ্বজা। কোথায় তাঁদের আশ্বাস? আশান্বিত ভারতবাসী উৎকণ্ঠায় চোখ রাখেন টিভির পর্দায়। ধর্মতলার টিভি শোরুমের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া ব্যস্ত মানুষদের দেখে বোঝা যায়। হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। ভিড়ের মাঝে জিজ্ঞাসা করেন - দাদা ভারতের তীরন্দাজি দল লড়ছে? ঘড়ি দেখে নিলেন। আধঘন্টা দাঁড়িয়ে নষ্ট করলেন মূল্যবান সময়। দীপিকা কুমারী, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইলা দেবীরা তীর ছুঁড়লেন। হল না লক্ষ্যভেদ। অথচ লন্ডন যাওয়ার আগে সাই (স্পোর্টস অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া)- এ দশে দশ। আবার কোনক্রমে জিতে গেলে তো কথাই নেই। বিমানবন্দর থেকে বাড়ি, বর্ষকালীন উৎসব। ''অলিম্পিকে যাওয়ার কয়েকদিন আগে'' এবং ''পদক জিতলে'' এই দুই বাক্যের মাঝে বিস্তর সময়ের ব্যবধানে থাকে না কোনো ব্যস্ততা বা আন্তরিকতা। পদক তালিকা দেখলেই বোঝা যায় আমাদের মহান দেশ ঠিক কত নম্বরে। ২০১২ লন্ডনে সামার অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করেছেন ৮১ জন ভারতীয় (৫৮ জন পুরুষ ও ২৩ জন মহিলা) মোট ১৩ টি খেলার ৫৪ ইভেন্টে। বিগত অলিম্পিকে সম্মিলিত ভাবে একবার ১৮টি পদক এলেও ১১টি পদক ছিলো ভারতীয় হকি দলের। ১৯৮০ সালের পরে সেই গৌরব ম্লান । ২০০৮ অলিম্পিকে যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বেই হার হয় ভারতীয় হকি দলের। ২০১২-এ আরও লজ্জাজনক! একটি ম্যাচেও জয় নেই। থাক আর কাদা ছিটিয়ে লাভ নেই। বরং দেখা যাক এককভাবে ১১ জন পদকজয়ীকে। অভিনব বিন্দ্রা, রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, কাসবা দাদাসাহেব যাদভ, লিয়েন্ডার পেজ, কারনাম মালেশ্বরী, বিজেন্দ্র সিং, সুশীল কুমার, মেরী কম, সাইনা নেওয়াল, বিজয় কুমার, যোগেশ্বর দত্ত ও গগন নারাং। শেষের ছ'জন ২০১২-র অলিম্পিকে পদক বিজয়ী।

অলিম্পিকে ৮০ বৎসরের ইতিহাসে ভারতের একমাত্র একক ভাবে সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রা, ২০০৮ এ এথেন্সে অলিম্পিকে সম্ভব না হলেও ২০০৮-এ বেজিং অলিম্পিকে সম্ভব করেছেন। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল সুটিং-এ ৭০০.৫ পয়েন্ট পেয়ে সেনা অফিসার রাঠোর যুগ্ম বিভাগেও সুটিং এ পদক জিতেছিলেন। কাসাবা দাদাসাহেব যাদভ ভারতের প্রথম পদকজয়ী প্রতিনিধি। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ৫২ কেজি বিভাগে কুস্তিতে পদক জেতেন পকেট ডায়নামো ডাকনামে খ্যাত যাদভ। লড়াই করেছেন সাতজন প্রতিযোগীর

বিরুদ্ধে, রাশিয়ার বিখ্যাত কুস্তিগীর বেকভ ম্যানোভকে হারানোর পর জাপানের সোনাচি ইশিকে হারিয়ে ফাইনালে পৌছে জিতে ছিলেন রুপো। দাদাসাহেবের পদক জয়ের পর পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরের পদকের জন্য। ১৯৯৬ এ আটলান্টাতে টেনিসে ব্রোঞ্জ জয়ী হন লিয়েন্ডার পেজ। একক ভারতীয় হিসাবে দ্বিতীয় পদক, ব্রাজিলের ফার্নান্ডো মেলিজেনিকে হারিয়ে ব্রোঞ্জজয়ী লিয়েন্ডার সেমিফাইনালে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দ্রে আগাসীর কাছে পরাজিত হন। এরপর প্রথম ভারতীয় মহিলা পদকজয়ী কারনাম মালেশ্বরী ২০০০ এ সিডনি অলিম্পিকে ৬৯ কেজি বিভাগে ভারোত্তোলনে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন, ২৮০ কে.জি. ভারত্তোলন করেছিলেন। ২০০৮ এ বেজিং অলিম্পিকে একা ভারতীয় পদকজয়ী বক্সার বিজেন্দ্র সিং। ইকুয়েডরের কালোস গঙ্গোরা মারকাডোকে ৭৫ কে.জি. বিভাগে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন বিজেন্দ্র। একই দিনে আর এক ব্রোঞ্জজয়ী সুশীল কুমার। হারিয়েছিলেন কাজাকিস্থানের লিওনিড স্পিরিডোনভকে।

২০১২ অলিম্পিকে দু'টিমাত্র রুপোজয়ী বিজয় কুমার ও সুশীল যাদব। শুটিং-এ রুপো জিতেছেন ভারতীয় সেনা অফিসার বিজয় কুমার। পরের ধাপে ব্রোঞ্জজয়ী গগন নারাং। সাইনা নেওয়ালের পদকজয়ী ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম রাউন্ডে হেরেও অবসৃত চীনা প্রতিদ্বন্দ্বী ছেড়ে ছিলেন সাইনাকে, সাইনা অবশ্য বলেছেন তিনি এভাবে পদক জিততে চাননি। চতুর্থ পদক মেরী কম। মণিপুরী যমজ সন্তানের মা মেরীর লড়াই তারিফ করার মতো হলেও শেষ রক্ষা হয় নি। ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ান বক্সারকে। যোগেশ্বর দত্ত কুস্তি থেকে পেলেন ব্রোঞ্জ। এবার নিয়ে একক ভাবে মোট ১৩টি (১২ জন অ্যাথলিট এবং ১৩ টি পদক, সুশীল কুমার দুই অলিম্পিকে ১টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ) অলিম্পিক পদক। ব্যাস এবারের মতো সন্তুষ্ট ভারতবাসী। আপাতত এই নিয়েই চার বছর কাটানো যাক। সগর্বে বলতে থাকি এই প্রথম ভারত একটি অলিম্পিকে একক ভাবে ছয় ছয়টি পদক জিতেছে। দেখবো না কিন্তু - চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা কিংবা ছোটো দেশ হল্যান্ড, কানাডা, হাঙ্গেরী কতগুলো পদক জিতেছে? না! লজ্জা পেয়ে যেতে পারি। যাক, ওসব কথা, আমরা অপেক্ষা করতে থাকি ২০১৬ অলিম্পিকের জন্য। আপাতত ওই বুলিটাই আওড়াই -- ''ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।''

অমরত্ব লাভ করুন মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান করে।
অসুস্থকে অঙ্গদানে সুস্থ ও দু'জন দৃষ্টিহীন মানুষকে পৃথিবীর আলো দেখান।।

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান সংগ্রহ কেন্দ্র (সমূহ)

জাতীয় চক্ষু দান পক্ষ পালন উপলক্ষে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান সংগ্রহ কেন্দ্র সমূহর উদ্যোগে অমরাগড়ী চক্ষু চিকিৎসালয়ে ৮ই সেপ্টেম্বর মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদানের সচেতনতা উপলক্ষে এক আলোচনা সভা এবং চক্ষু ও দেহদানকারী পরিবারকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়।

যোগাযোগ করুন ঃ
অমরাগড়ী যুব সংঘ (৯৪৩৪৫৬৪৯৪৯),
জয়পুর সাধনা সমিতি (৯৩৩৩৬৩৪৮৫৫),
কলবাঁশ ফ্রেন্ডস ইউনিয়ান ক্লাব (৯৭৩২৬৪১৭০৮),
পলাশপাই নেতাজী ব্যায়াম সমিতি (৯৭৩৩৬৯১৬৮২),
হায়াৎপুর নেতাজী সংঘ (৯৭৩২৭৩৯০৩৬),
নতীবপুর পল্লী সেবা সমিতি (৯৭৩৩৮৪০৫০৩),
দৌলতচক প্রগতি সংঘ (৯৭৩২৬৯৮১৭১),
চকশালিকা যুবক সংঘ (৯৭৬২৮২৯২৮৯)

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান সংগ্রহ কেন্দ্র সমূহের আয়োজনে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান সংগ্রহের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ বর্ষ পদযাত্রা ২২-২৩ শে ডিসেম্বর হবে। পদযাত্রা শুরু হবে অমরাগড়ী যুব সংঘ থেকে শিবপুরের শরৎচন্দ্রে বাড়ি হয়ে বিবেকানন্দের জন্মভিটা পর্যন্ত।

প্রসঙ্গ হাঁটুর চোট

ডাঃ চন্দন দে হাজরা

বছর দেড়েক আগে গিয়েছিলাম বাঁকুড়ার এক অনামী গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজে। জীপ দাঁড় করানো হল এক জীর্ণ চায়ের দোকানের সামনে, প্রায় সংগে সংগে অনতি দূরে কাতর কণ্ঠে শোনা গেল ''-- বাবারে পড়ে গেছি রে হাঁটুটা গেল, তোল আমাকে .....'' পড়ি কি মরি করে দোকানী ছুটল তার খুড়োকে সাহায্য করতে। চা খাওয়া মাথায় উঠলো। কৌতুহল বশত কাছে গিয়ে দেখি খুড়োর হাঁটুর উপর জোর মালিশ চলছে। এক বয়স্কা মন্তব্য করলেন ও হাঁটুটা মুচকিয়ে গেছে এক্ষুনি সেরে যাবে সেঁক দে। ওর কথা শেষ হতে না হতেই গামছা গায়ে দেওয়া এক যুবক বলে ওঠে, না না আমি জানি এ হল লেইগামিন্টের চোট, খুড়োরে বেশ ভোগাবে আমি স্তম্ভিত! এই নির্জন গ্রামেও লিগামেন্টের চোট এর খবর রাখে, মনে মনে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানালাম প্রচার মাধ্যমকে।

এইবার প্রশ্ন দাঁড়ালো লিগামেন্ট কাকে বলে? এবং তার চোটই বা কী? সকলের জানা আছে মানুষের শরীরটাকে খাড়া করে ধরে রাখে বিভিন্ন মাপের এবং আকৃতির হাড় এবং মাংসপেশী। প্রতিটি হাড় পরস্পরের সংগে ধরে থাকে এবং তাদের সুনির্দ্দিষ্ট দিকে নড়াচড়া করতে পারে এক প্রকার Fibrous Tissue -র সাহায্যে তাকেই বলে লিগামেন্ট। হাড়ের সন্ধিস্থল বা জয়েন্টকে যথেষ্ট বাঁকাতে বা ঘোরাতে আমরা বাধা পাই এই লিগামেন্ট থাকার কারণেই। হাত বা পায়ের কথাই ধরা যাক হাঁটু বা কনুই সোজা করার পর আরও খোলা যায় কি? যায় না, যে কোন জয়েন্টকে যতটা বাঁকানো যেতে পারে তারপরেও যদি জোর করে চাপ দিয়ে বাঁকানো যায় তাহলে খুবই ব্যথা লাগে এবং এই লাগে বলেই আমরা স্বেচ্ছায় লিগামেন্টের উপর অযথা অত্যাচার করি না। এবার কোন কারণে যদি কেউ পড়ে যায় বা হ্যাঁচকা লাগে এবং তার ফলে যদি চোট আসে তবে সাধারণত সেটাই হয়ে দাঁড়ায় লিগামেন্টের চোট। এই চোট খুব মামুলি আকার থেকে নিয়ে ছিঁড়ে দুই টুকরো হয়ে যেতেও পারে। চোটের পরেই শুরু হয় অসম্ভব ব্যথা, যন্ত্রনা, ফোলা, নীল বা কালো হয়ে যাওয়া নড়াচড়া করতে না পারা ইত্যাদি। এই সময় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত খুব বড় ভুল করে চোট লাগা অঙ্গ অহেতুক টানা হেঁচড়া, মালিশ এবং গরম সেঁক করে। খুড়োর বেলাতেও সেটাই শুরু হয়েছিল এবং হয়তো চলতো আমরা না থাকলে।

মানুষের শরীরে প্রত্যেকটি হাড়ের জয়েন্টের গঠন ও গড়ন বিভিন্ন। সময়াভাবে জয়েন্টের প্রসঙ্গে যেতে চাইছি না।

মোটামুটি ভাবে দেখা যায় লিগামেন্ট দুই প্রকারের, ১. জয়েন্টের ভেতরের লিগামেন্ট যা দু'টি হাড়কে পরস্পরের সংগে শক্ত করে ধরে থাকে, ২. জয়েন্টের বাইরের দিকে মোচার খোলের মতো লিগামেন্ট জয়েন্টটিকে ধরে থাকে এবং অপসরণ বা Displacement এর হাত থেকে বাঁচায়। প্রত্যেক মাংসপেশী কমপক্ষে দুটি হাড়ের সংগে যুক্ত, তাদের এক বা দু'দিক পেশীর রূপ পরিবর্তন করে এক প্রকার খুব শক্ত সাদা প্লাস্টিকের কর্ডের আকারে লিগামেন্টে পরিণত হয়। যেমন গোড়ালির পিছনের দিকে যেটা দেখে থাকি এর ডাক্তারী নাম Ligament Neuchi। আবার মাংস খাবার সময় কখনও কখনও একরকম সাদা লাম্বা টুকরো দাঁতে লাগে যাকে চিবিয়েই শেষ করা যায় না। সেটাও কিন্তু Ligament। এই Ligament এত শক্ত ও মজবুত যে হাড় দুর্বল থাকলে চোট যদি বেশী হয় ওই নরম হাড়ের একটা অংশ ভেঙে বেরিয়ে আসে, এক্ষেত্রে অবশ্য হাড়ের সার্জারী প্রয়োজন হয়।

এবার বলি চোট লাগলে কি করবো ---- একটা ইংরাজী শব্দ মনে রাখতে হবে RICE যার বাংলা অর্থ ভাত। আশা করি বাঙালীরা সহজে ভাতের কথা ভুলবেন না। RICE-এর প্রথম অক্ষর ''R''-এ বোঝায় Rest অর্থাৎ চোট লাগা অংশকে আরাম দেওয়া এবং নড়াচড়া না করানো। যাতে চোট যা হয়ে রয়েছে তা আর না বাড়তে পারে।

RICE-এর ''I'' এর দুটো অর্থ - ১. ICE বা বরফ ও ২. Immibulisation।

বরফ বা ঠান্ডা প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বরফ কখনই খোলা অবস্থায় দেওয়া চলবে না। পাতলা কাপড়ে মুড়ে বা পলিথিনের ব্যাগে করে লাগাতে হবে এবং ১৫-২০ মিনিট অন্তর ২-১ মিনিটের Rest দিতে হবে। বরফ দিলে ওই জায়গার শিরা ও ধমনী গুলো সংকুচিত হয়ে রক্ত ক্ষরণ কমে এছাড়াও বরফ প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা অসাড় করে দেয়। দ্বিতীয় Immiblisation এর অর্থ চোট লাগা অংশের নড়াচড়া না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

এবার RICE এর 'C' প্রসঙ্গে বলা যায় এর অর্থ Compression অর্থাৎ Bandage করে চোটলাগা জায়গায় চেপে ধরে রাখা যার ফলে রক্ত বা রক্তরস জমা হয়ে জায়গাটা ফুলিয়ে না দিতে পারে।

শেষ অক্ষর 'E' এর অর্থ Elevation বা চোটের জায়গাটা Heart -এর উচ্চতার চেয়ে উঁচু করে রাখা যার ফলে জমে থাকা রক্ত বা জলীয় পদার্থ মাধ্যাকর্ষনের নিয়ম অনুযায়ী নীচের দিকে নেমে এসে ফোলা কম হয়। উঁচু থাকার কারণে রক্তচাপ কমে যায়,

ফলে নতুন করে ফুলতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারদের মতে Ligament চোটের জটিলতা পরবর্তীকালে শতকরা ৫০ ভাগ কম হয়।

এর পরের কাজ অতি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া, জটিলতা বা হাড়ভাঙা থাকলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেও চোটের প্রকৃতি নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসার দায়দায়িত্ব কিন্তু ডাক্তারের তাই অহেতুক ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন নেই।

আজ আলোচনায় তাহলে আমরা জানতে পারলাম Ligament কি? তার চোট কি? তার প্রাথমিক চিকিৎসা কি হবে। তার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা। এই সংগে আসুন আমরা সংকল্প করি হাড়ে চোট বা Ligament -এ চোট লাগলে প্রচলিত টানা হেঁচড়া, মালিশ বা গরম সেঁক দিয়ে অকারণে রোগীর ক্ষতি না করে বরং RICE- পদ্ধতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োগ শুরু করি। এও এক মহান সেবা, কল্যাণ হবে অনেক মানুষের।

না নিবন্ধ

শরৎ-রবীন্দ্র উবাচ

অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস, গল্পের নাম নিয়ে পত্র

*ভাই **শ্রীকান্ত**,*

***আলোছায়া**র মধ্যে তোমায় চিঠি লিখছি। একথা জানাই **মামলার ফল** থেকে **অনুপমার প্রেম** সার্থক হয়েছে। আরও অনেক খবর তোমায় না জানালে বড়ই দুঃখ পাব।*

***বড়দিদি** আর **মেজদিদি** সব কাজ থেকে **নিষ্কৃতি** দিয়েছেন **কাশীনাথ**কে। **দেনাপাওনা পল্লীসমাজ**'কে এমন একটা স্তরে নিয়ে গেছে যে **তরুণের বিদ্রোহ** হলেও কোনও কাজ হয়নি। শুনেছি **রমা, বিজয়া** এ ব্যাপারে ওদের পাশে দাঁড়িয়েছে যাতে **নারীর মূল্য** পায়। **বিপ্রদাস** বন্ধু **দেবদাস**কে বলেছিলেন ''তুমি তো **চরিত্রহীন** নও, তুমি তো সমাজের উচ্চবিত্ত, পারো না, **নব বিধান** করে পথ নির্দেশ দিতে''? **বামুনের মেয়ে**র কাছে খবর পেলাম যে **বিন্দুর ছেলে**'কে এখন পন্ডিত মশাই পড়াচ্ছেন। শুনলে অবাক হবে **শুভদা**'র **দর্পচূর্ণ** করতে এসে **একাদশীর বৈরাগ্য** হয়েছে। **চন্দ্রনাথ** কি **বৈকুণ্ঠের উইল** পড়েছে? উইল থেকে কিছু প্রাপ্তি যোগ না থাকলে **ছবি, হরিলক্ষী, বিলাসী**'দের কি আধসরা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে? জানো তো **আঁধারে আলো**'য় **গৃহদাহ** হয়ে **ষোড়শী** এখন পর্ণ কুটিরে ঠাকুর সেবায় ব্যস্ত। তুমি কি খবর পেয়েছ **মহেশ** হারিয়ে গেছে? আর **রামের সুমতি** হয়েছে। শেষ প্রশ্ন তোমার কাছে **অরক্ষণীয়া পরিনীতা** হয়ে স্বামী লাভ করেছে কি? তুমি বলেছিলে তোমার একটা **পথের দাবী** আছে। কি সেটা অতি অবশ্যই জানিও। পরিশেষে জানাই **অভাগীর স্বর্গলাভ** হয়েছে।*

ইতি

অনুরাধা সতী** ও **পরেশ

চু - চেন - তাং

চু - চেন - তাং কার নাম জানা আছে? যদি না জানা থাকে অন্যদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। অবাক কান্ড যে নামটি আর কারও নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

রবীন্দ্রনাথের এমন নাম কেমন করে হোলো? রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বকবি। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রণ আসতো। সব দেশেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে চীন দেশে হাজির হলেন। সালটা ছিল ১৯২৪ এর মে মাস। কবির জন্মমাস। মহাচীনের মানুষেরা খুব খুশী। চীন সম্রাট স্বয়ং অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর রাজপ্রাসাদেই কবিকে রাখার বন্দোবস্ত করেন।

জন্মদিনে কবিকে পরানো হোলো নীল পায়জামা, কমলারঙের আলখাল্লা আর মাথায় বেগুনী রঙের টুপি। চীন দেশের রীতিতেই পালন হোলো তাঁর জন্মদিন। স্বয়ং চীন সম্রাট উপহার দিলেন চারশ বছরের পুরানো একটা ছবি।

কবি চীন দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, বিশ্বমানবতার বাণী। ভারত চীন মৈত্রী দীর্ঘজীবি হোক এই আশীর্বাদই করলেন। চীন দেশের মানুষ কবিকে খুব ভালবেসে এবং আপনজন করে নিয়ে নতুন নামকরণ করল - চু - চেন - তাং। চীনদেশের ভাষায় এর মানে হোলো - ''বজ্রের মতো পরাক্রান্ত ভারত সূর্য''।

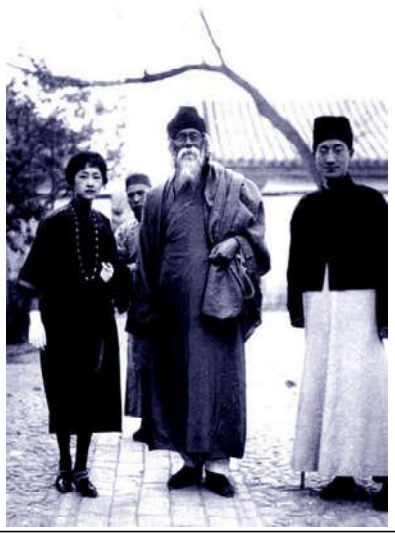

বাংলার আইনজীবী পেশার জন্ম

কাজল সেন

স্বাধীন বুদ্ধিভিত্তিক পেশা হিসাবে সর্ব মহলে প্রশংসা পেয়েছে আইনজীবী পেশা। ভারতবর্ষে আইনজীবী শ্রেণীর জন্মদাতা হিসাবে স্যার ইলাইজা ইম্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে ১৭৭৩ সালে রেগুলেশন অ্যাক্ট -এর দৌলতে কোলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। প্রথম প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ হন স্যার ইলাইজা ইম্পে। তিনি কোর্টের কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করার পর তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না। ফলে আইনজীবী শ্রেণীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং আইনজীবী শ্রেণীর জন্মলাভ হয়। তখনকার দিনে আইনজীবীদের মনোনীত করার সময় তিনটি মানদন্ড থাকলে আদালত কর্তৃক সনদ প্রদান করা হোত। এই তিনটি মানদন্ড ছিল এক, কোর্টের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান; দুই, ফরাসী ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান এবং হিন্দু মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে জ্ঞান। ১৯৭৩ সালের রেগুলেশনে শিক্ষিত , চরিত্রবান আইনজ্ঞ ব্যক্তিকেই উকিলের সনদ দেওয়া হতো।

সে সময় উকিলেরা একশ্রেণীর পরামর্শদাতা বা এজেন্ট নিয়োগ করত। তাদের বলা হোত মোক্তার। ১৮১৪ সালে আইন করা হয় যে কোর্টের অনুমতি ছাড়া কেউ মোক্তার নিয়োগ করতে পারবে না। তারপর থেকে এই মোক্তারই আইনজীবীদের মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মামলা চালাতে পারতেন। পরবর্তীকালে মোক্তার পদটি বিলুপ্ত হয়।

আইনজীবীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে ১৮২৬ সালের রেগুলেশন-এ বলা হয় যে ব্রিটিশ রেগুলেশন সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে, দেশীয় ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে এবং হিন্দু -মুসলিম আইনে পারদর্শিতা থাকলে তাঁরা যে কোন জেলা কোর্টে ওকালতি করার সনদ পাবেন।

১৮৩৪ সালে সর্বপ্রথম দেওয়ানি এবং ফৌজদারী আইন লিপিবদ্ধ আকারে বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৩৭ সালে ফরাসী ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী রাষ্ট্র ভাষা হয়। এর ফলে কোর্ট সমূহে ইংরাজী ভাষা জানা লোকেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৫৫ সাল থেকে আইন পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭৪২ জন বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন। সেই একই সময় বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) থেকে ৩৩ জন ও মাদ্রাজ থেকে ৭৮ জন বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮১ সালের এক পরিসংখ্যানে জানা যায় সারা ভারতে মামলার সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ, তারমধ্যে বাংলায় (উভয় বাংলা) ছিল ৫ লক্ষ। চিরস্থায়ী

শম্ভুনাথ পন্ডিত (১৮২০-১৮৬৭)

বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় মোকর্দ্দমার সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আইন ডিগ্রীধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এরপর কোলকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হোল। ১৮৬৩ সালে কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী জজ হিসাবে রাজা রামমোহন রায়ের সুপুত্র রমাপ্রসাদ রায় নিযুক্ত হন। কিন্তু কার্যভার গ্রহণের আগেই তিনি পরলোক গমন করেন। সেই স্থানে শম্ভুনাথ পন্ডিতকে নিয়োগ করা হয়। এঁরা দু'জনেই সুপন্ডিত ও অত্যন্ত দক্ষ আইনজীবি ছিলেন।

এই কোর্টের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে কিভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হোল। প্রথমে এর নাম ছিল ''সুপ্রিম কোর্ট অ্যাট ফোর্ট উলিয়াম ইন বেঙ্গল''। নানা নিন্দনীয় ঘটনার প্রায় একশো বছর পর কোলকাতা হাইকোর্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১লা জুলাই ১৮৬২ সালে। প্রথমে এর নাম ছিল '' হাইকোর্ট অব জুডিক্যাচর অ্যাট ফোর্ট উইলিয়ম''। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ১৯৫০ এ সংবিধান গৃহীত হলে হাইকোর্ট অব ক্যালকাটা বা কোলকাতা হাইকোর্ট। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি কেন্দ্র শাসিত আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জও এই হাইকোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত। এই হোল কোলকাতা হাইকোর্টের সংক্ষিপ্ত জন্ম কাহিনী।

১৮৫০ সালে Francis Frith এর তোলা কলকাতা হাইকোর্টের ছবি

যুগের হাওয়া

মালতী দাস

- ভালো কাজে ভাঙানি
  আছে চোখ রাঙানি
  মন্দেতে নেই বাধা
  যুগ নাকি সিধেসাদা।।

- রাতে করো মস্তানি
  দিনে থাকো সাধু
  বাঁচা ভারি শক্ত রে ভাই
  যে জানে না এ যাদু।।

- গাছে দিলে জল
  তবে পাবে ফল
  মনে পাবে বল
  করো যদি দল।।

- এখন মার খায় না মানুষ পিঠে
  মার খায় যে পেটে
  করবে বাজার কেমন করে?
  আকাশ ছোঁয়া রেটে।।

- থাকলে মান হুঁশ, তবেই মানুষ
  জাত কি রে হয় ভিন্ন?
  রক্তের রং সবারই এক
  সেই একতার চিহ্ন।।

- উপর দিকে চাইতে হলে
  নীচের দিকে চাইতে হয়
  নইলে পরে হোঁচট খেয়ে
  বিপদ মাঝে পড়তে হয়।।

- আজ মান হুঁশ, ছেড়ে গেছে
  মানুষের দেহ
  বিলুপ্ত প্রেম প্রীতি
  ভালোবাসা স্নেহ।।

- পারব না দেখাতে
  চিরে এই বক্ষ
  করি নাকো কোন দল
  থাকি নিরপেক্ষ।।

- সুখ বড় সূক্ষ্ম
  ধরে রাখা দায়
  দুঃখ সে রুক্ষ
  যেতে নাহি চায়।।

- কর্মই ধর্ম
  বুঝলেই মর্ম
  জীবনটা বাঁচবে
  ঝরালেই ঘর্ম।।

- বিশ্বাসে বাঁচে ভালবাসা
  সন্দেহে হয় চূর্ণ
  শুধু চোখে মুখ নয়
  পরশে সে হয় পূর্ণ।।

- কেন বাবা যুদ্ধ
  নিয়ে পণ প্রথা
  সময়টা নষ্ট
  করো অযথা,
  ছিল আছে থাকবে
  হবে নাকো বন্ধ,
  ফুল নয় এতে আছে
  অর্থেরই গন্ধ।।

- বুঝলে তোমায় বোকা
  দেবেই লোকে ধোঁকা
  ভাবছ যাকে সাধু
  আরে সেই তো চুরির যাদু।।

- নকল হলেই রঙ চঙে সাজ
  আসল আছে, তেমনই আজ
  মানুষ হয়, মান আর হুঁশে
  মান মেরে হুঁশ, বাঁচে ঘুষে।।

- চিনবে মানুষ উপায় নাই
  চরিত্রটাই গোলমেলে ভাই।।

M/S Techno Fabricating Concern

Shanpur Bhagwan Das Math, P.O.- Dasnagar, Howrah-711105

Manufacturing of Impeller, Ducting, Casing, Chassis, Floor Plate, Gear Box etc.

Contact with -- Radha Raman Hazra & Kamalesh kumar Manna
Ph. - (033) 2667-6926

বিভূতিভূষণ ও মধ্য কলকাতার এক বিদ্যালয়

তাপস বাগ

কালজয়ী উপন্যাস পথের পাঁচালী-র রূপকার হিসাবে তিনি আজ বিশ্ববন্দিত। বহু সার্থক উপন্যাস ও ছোট গল্পের জন্য বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কথাসাহিত্যিক হিসাবে সর্বজন পরিচিত হলেও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। মধ্য কলকাতার এক বিদ্যালয়ে বেশ কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন।

কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা মোড় থেকে লেনিন সরণী ধরে এগোলে ওয়েলিন্টন স্কোয়ারের কাছাকাছি অঞ্চলে ছিল অধুনালুপ্ত এক বিদ্যালয়, নাম 'খেলাৎচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন'। ঠিকানাটি হল ৬৪এ, লেনিন সরণী। যদিও আনুমানিক ১৮৬০ সালে বিদ্যালয়টি বউবাজার স্ট্রিটে প্রথম স্থাপিত হয়। পাথুরিয়াঘাটার দানশীল জমিদার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একজন ব্রিটিশকে হেডমাস্টার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। সাহেব মানুষটি ঐ পরিবারের গৃহশিক্ষকও ছিলেন। খেলাৎচন্দ্র ঘোষের এস্টেট-এর অনুদান থেকে এই স্কুলের আর্থিক দায়ভার বহন করা হত। বউবাজার অঞ্চল থেকে স্কুলটি ওয়েলিন্টন স্কোয়ারে (উল্লেখিত স্থানে) স্থানান্তরিত হয়।

আনুমানিক ১৯৩৪ সালে এই বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াতেন। পরবর্তী সময়ে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা পড়াতেন। ছাত্ররা বি.বি.বি.স্যারের, অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাস বেশ উপভোগ করত। কারণ স্যার যে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দারুণ সব গল্প বলতেন। বিভূতিভূষণের এক কৃতী ছাত্র ঐতিহাসিক জেলেপাড়ার সং এর সভাপতি শঙ্করপ্রসাদ দে-র কাছে শোনা - স্যার স্কুলে আসতেন ধুতি, পাঞ্জাবি আর ক্যাম্বিসের জুতো পরে। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে বলতেন নিজের ছেলেবেলার কথা, গাঁয়ের ছায়াস্নিগ্ধ জনপদের কথা, গ্রামের হাটের গল্প। ইছামতী নদীতে দলবেঁধে স্নান, মাঝিমাল্লার গান, বনজঙ্গলের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই গভীর টান, রাতে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শোনা। মাস্টারমশাইয়ের স্মৃতিকথার মেদুরতায় ছাত্ররাও বিভোর হয়ে থাকত। বিভূতিভূষণের অনবদ্য বাচনশৈলী ছাত্রদের নিয়ে যেত ছায়া-ভরা সুনিবিড় সবুজের অরণ্যে। যেখানে পাখির কলকাকলি, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, মাছরাঙাদের শিকারের অনন্য কৌশল ছুঁয়ে যেত ছাত্রদের স্বপ্নময় জগতকে।

কলকাতায় শিক্ষকতাকালীন কথাসাহিত্যিক থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের (বর্তমান রাজা রামমোহন সরণী) এক মেসে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মেসবাড়ি অনেকটা পথ তিনি পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। যে কথা বলার বিভূতিভূষণ স্যারের কৃতী ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তীকালে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। এঁদের একজন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অঙ্কে প্রথম হওয়া ছাত্রটি পরবর্তীকালে ডাক্তারি পাশ করে টেস্টটিউব বেবি নিয়ে গবেষণা করে সফল হন। যদিও সরকারী স্বীকৃতি না পাওয়ার অভিমানে আত্মহত্যা করেছিলেন। কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ ও প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায় বিভূতিবাবুর দিকপাল ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও বিভূতিস্যারেরই ছাত্র। মধ্য কলকাতার এই স্কুলটি ছাড়াও হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া ও হরিনাভীতেও বিভূতিভূষণ বেশ কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানী সেনাদের বোমাবর্ষণের আশঙ্কায় কলকাতার বহু মানুষ সে সময় শহর ত্যাগ করেন। কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় কলকাতার প্রায় সমস্ত স্কুল-কলেজ। ১৯৪২ সালে বিদ্যালয়গুলি খুলে পুনরায় পঠনপাঠন শুরু হলেও বিভূতিভূষণের স্মৃতি বিজড়িত খেলাৎচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন আর খোলেনি। অবলুপ্তির তালিকায় সংযোজিত হল স্বনামধন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বেশ কয়েকবছর আগেও স্কুলবাড়ির ফটকের ডানদিকে শ্বেতপাথরে খোদিত খেলাৎচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন নামাঙ্কিত ফলকটি বর্তমান ছিল। এখন আর কোন স্মৃতিচিহ্নই অবশিষ্ট নেই। বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ স্যারের স্মৃতিচারণা করতে বসে আজও একবুক গর্বে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ডাঃ আবিরলাল, শঙ্করবাবুদের। এই নিবন্ধের মধ্য দিয়ে হেরিটেজ কমিটির কাছে অনুরোধ জানাই ঐতিহ্যের সাক্ষী এই বাড়িটিকে অবিলম্বে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষণা করা হোক।

বলাই ষাট

পল্টু ভট্টাচার্য

"জীবনটাই আর কিছু নয়
এক মুঠো ধুলো
চৈতি বাতাসে ওড়া
শিমুলেরই তুলো"

জন্মেছিলাম কুশ পা নিয়ে, সুদূর গয়া থেকে দাদু (মার বাবা) মাকে লিখেছিলেন 'ভুতু হতাশ হয়ো না, তোমার এই ক্ষণজন্মা সন্তান তোমার মুখ উজ্জ্বল করিবে। ইহার অনুধাবন শক্তি গভীর'। মাত্র তিন মাস বয়েসে ডাঃ উমেশ চক্রবর্তী আমাদের বনেদি পারিবারিক কুসংস্কারকে গ্রাহ্য না করে আমার বাঁ পাটা অপারেশন করলেন। চিংড়ি মাছের মতো দু-তিনবার আমি নড়াচড়া করে অপারেশন টেবিলে স্থির তখন মা আমায় দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল।

বাঁ পায়ে উঠল লম্বা এ্যালুমিনিয়ামের চ্যানেল লাগানো এক ভারি জুতো। আমায় কোলে করতে করতে মার বুক থেকে পেট অবধি দগদগে ঘা, তবু মা আমায় মাটিতে নামায়নি। কিন্তু বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের হেঁসেল কি একটা খোঁড়া ছেলেকে নিয়ে সামলান যায়? তাই আমার স্থান হলো বাড়ির চাকর বাকর, নাপিত এবং রজক কাকার কোলে। দিন রাত এবাড়ি ওবাড়ি ঘোরা। যাক বছর ছ'য়েকের মধ্যে পা টা মোটামুটি ঠিক হলো। অর্থাভাব আর পায়ে নতুন জুতো পরতে দিল না। স্কুল, খেলা সবই চললো, মা, মামনি (বড় জেঠিমা), মনিমা (মেজ জেঠিমা), ন-কাকিমা, নতুন কাকিমা, ছোট কাকিমা, দিদি, মেজদি, ছোড়দিমণি আর সব তুতো দিদি-দাদাদের মধ্যে চলল আমার দাপাদাপি। কেউ বলে পাতা, কেউ বলে ভোজন বিলাস (খুব হ্যাংলা ছিলাম), কেউ বলে গজা। মা কিন্তু তার পল্টুকে নিয়ে দুষ্টুমির জন্য জেরবার। নিজেরা দুভাই ও এক বোন। মা তো বাইরে থেকে চাবি দিয়ে সংসার ঠেলতে যেত। পাঁচজনের ভিড়ে লেখাপড়া হবে না বলে মার এই নীতি। লোকে ঠেস দিয়ে বলত জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। ঘরের ভিতর আমরা দুষ্টুমি করতাম কিন্তু মার পিঠে বাঁধা চাবির গোছার শব্দ পেলেই আবার বই মুখো।

স্কুল শেষ করার মুখে মুখে বাড়িতে একটা ছোট্ট ঝড় এলো। সবায়ের হাঁড়ি আলাদা হলো। স্বল্প রোজগারে বাবা অভাবের কষ্ট মেটাতে রামচন্দ্রের ছবির সামনে রামের ভজন গান, খাতায় লেখেন প্রতিদিন একশো রামচন্দ্রের নাম। মা ও তাই। আমাদের ত্রাতা মাসিমণি নানারকম ভাবে সাহায্য করে সেদিনের সেই অভাবের আগুন অনেকটাই নেবাতো, তাই মার কাছে বকুনি খেলেও মাসিমণি ছাতার মতোই আগলাতো আর আশকারা দিত। স্কুল ছাড়ার পর খেলা আর অভিনয় দ্বিতীয় জীবন হয়ে দাঁড়াল। কলেজের মাঝপথে কাঠের দোকানে বসা, চা বিক্রি, পেন সারানো, এসব টুকটাক কাজ করে বাবাকে সাহায্য করা। গ্র্যাজুয়েট হয়ে ঔষধ বিক্রির পেশায় সবে ঢুকেছি। বাবা চোখ বুঝল। কিন্তু লড়াকু মা নাছোড়বান্দা। দাদাকে চাটার্ড করা, বোনের বিয়ে, নিত্য সংসারের সংগ্রাম অটল। তারপর বাড়িতে এলো এক সুনামী। প্রায় তিরিশ বিঘের বাড়ি, পুকুর, বাগান, উঠোন, মন্দির, দালান। পাঁচিলে পাঁচিলে ছিন্নভিন্ন। সবার মুখ দেখাদেখি বন্ধ। নিজের দাদা বাইরে কর্মরত এবং বোনও শ্বশুরবাড়িতে। দিনরাত মা আমাকে অগলাত। আর আমি বীরপুরুষের বেশে মার পাশে।

কিন্তু বিষয় যে বিষ তা বুঝিনি সিকিভাগ সম্পত্তিকে ঘিরে দাদা, বোন পাওনাগন্ডা বুঝে দূরে সরে গেল। এই ধাক্কাটা মা আর সামলাতে পারল না। জ্বর আর মাথায় কষ্ট নিয়ে সেই যে শয্যা নিল আর উঠল না, পড়ে রইলাম আমি একা অতো বড় বাড়ির এক কোণে। আত্মীয়রূপী পরেদের তীব্র অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠল। জীবনে ভালবাসা এলেও তা স্থায়ী হয়নি কারণ মাতৃভক্তি ও প্রীতি নাকি এযুগে অচল। তবু আমি অকুণ্ঠ ভালবাসা, স্নেহ মমতায় ডুবে ছিলাম কিছু মানুষজনের জন্যে। আমার এক ঘনিষ্ঠ চল্লিশ বছরের বন্ধু আজও আমার পাশে সপরিবারে দাঁড়ায়। একা থাকার দুঃখ আমাকে কিছু মানুষজন ভুলিয়ে দেয় তাদের সাধ্যমত। আজ বসতবাড়ি, চাকরী সবকিছুই হারিয়েছি। তবু তাদেরই প্রেরণায় রোজ নতুন করে বাঁচি। এ আমার বড় পরম প্রাপ্তি।

আমাদের একান্নবর্তী সংসারে জন্মদিন পালনের রেওয়াজ ছিল না। সংসারের দুধের চাঁছি থেকে এক সংখ্যা তৈরী করে তার পাশে দুটো দানাদার রেখে মণিমা বলতো - 'ভজা আজ তোর জন্মদিন'। তাই পরমানন্দে খেতাম। তাই ষাট বছরে পা দেওয়ার প্রাক্কালে মনে এল জন্মদিন পালনের বাসনা। না কোন পরমাত্মীয় নয়, সেই সব মানুষজন যারা অতীত থেকে আজও আমার পাশে কখনও নিন্দায়, কখন প্রশংসায়, কখনো ভালবাসায় আমার কড়া শাসন করে তাদেরকে নিয়ে একটা সন্ধ্যা গান শুনে কাটাব। কিছু জলযোগ করব। হ্যাঁ এটাই আমার একান্ত বাসনা। আমার মা ভীষণ লোকজন নিয়ে হইচই করতে ভালবাসতো। হয়তো মা এই সন্ধ্যায় দিগন্তের অদৃশ্য প্রান্ত থেকে উঁকি দেবে। সবায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে বলাই ষাট। কখনো কোন বিপদ ঘটলে মা আমাকে বলতো 'আহা বালাই ষাট'। তাই ষাট বছরের পদার্পণে মার কথাই মনে পড়ল। মা বলতো দশের হও দেশের হও। জানি না কি হয়েছি, তবু মাকে দেখা হলে বলতে পারব 'মা তোমায় ভালবেসে আজও মনকে আমি বারবার প্রশ্ন করি আমার

এই গর্ব এই দম্ভ এই পরমাদর কি শেষদিন পর্যন্ত থাকবে?

স্বপনচারিনী মা

মাকে আমি আজও স্বপ্নে দেখি
নগ্নগায়ে আটপৌরে শাড়িটা জড়ানো
দু'গাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি পরা হাতে
হাসি মুখে চলছে খুনতি নাড়া।
দাঁড়া দিচ্ছি বলে সময়ের সাথে যুদ্ধ
ঘরভর্তি লোকের হই হট্টগোলের মধ্যে,
রান্নাঘরের গুমো গন্ধটা শাড়ির গায়ে
ঘুমের মধ্যে আমার নাকের কাছে,
মা, তুমি তো এক যুগ আগে চলে গেছো
কখনও কখনও আকাশের তারার পাশে
তোমায় দেখি উজ্জ্বল হয়ে তাকিয়ে আছ,
তবু যদি কখনও আমার মনে আনন্দ আসে,
যদি কখনও দুঃখ কিংবা হতাশা আসে,
কিংবা আসে উজ্জ্বল ভবিষ্যত চিন্তা
কি আশ্চর্য সে রাতেই স্বপ্নে তুমি আস,
কিন্তু কেন মা? আমারও তো বয়স হলো
চলে যাওয়ার ডাক মাঝে মধ্যেই শুনি
আবার ফিরে আসি ইহজীবনে।
কিন্তু তোমায় স্বপ্নে দেখি অবাক লাগে
প্রশ্ন জাগে তুমি কি যেতে চাও নি?
নাকি তুমি আমার একা থাকার কষ্টটা বোঝ?
তাই স্বপ্নে এসে আমার একাকিত্ব ঘোচাও?
বুঝেছি কাজ আমার এখনও হয়নি শেষ
তাই তুমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে আস -
যে দিন মশারির খুঁটটা খুলতে পারব না,
স্বপ্নহীন কাল ঘুমে পড়ে থাকবো একা,
সেদিন কি তুমি আমায় নিয়ে যাবে
তোমার তারাদের দেশে?

ছন্দবাণী

মর্ত্য বিতর্ক

অমিত কুমার রায়

দেব-শিশুরা খেলছে ওই মেঘের আঙিনায়
সোনার হরিণ আকাশ পারে পালকি চড়ে যায়!
ছেঁড়া মেঘে নরম রোদে ময়ূর নাচে ওই
সিংহটাও আছে ক্ষেপে পাড়ার হই চই!
নেংটি ইঁদুর হাতির শুঁড়ে সুড়সুড়ি দেয় ঢুকে
লক্ষী পেঁচা যায় না কোথাও বসে আছে ঠুকে।
হংস-রাজ মরাল-গ্রীবা বাড়ায় সুরে সুরে
যন্ডজী শূণ্য পথে সবুজ ঘাসের খোঁজ করে।
দুর্গা এবার মিটিং সারে কৈলাসের পারে
এবার সবাই আসবে মঙ্গল গ্রহ ঘুরে!
ঘোটক, নৌকো, গজ কেহ হবে না তার সাথী
কিউরিওসিটি চড়ে এবার ধরায় মারবে লাথি।
নাই খেতে পাক অবাধ্য সব সন্তান দল
ফুরিয়ে যাক শেষের দিনে পানীয় সব জল।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভাল লাগেনা ফিরতে পৃথিবীতে
উষ্ণায়নের দাপট নিয়ে মানুষ মজায় মাতে।
শব্দবাজির দুম্ দুমা দুম্ কানে লাগায় তালা
কেতো বলে -- এবার পুজোয় ধরায় যায় কোন্ শা .....
গানু বলে -- দেখছি দূরবীনেরই ফুটোয়
মেয়েরা সব কেমন করে পার্লারে চুল গুটোয়!
লক্ষী বলে -- ধরায় এবার ধান হয়নি ভালো
পেঁচার আমার পেট ভরতি রইবে কি আর বল!
বীনাপানি বাজাল তান সুরের লহর তুলে!
পৃথ্বীর সব ভূধর-সাগর ভূ-কম্পে ওঠে দুলে!
শিব বলেন, ওসব ছাড় চল যাই সবাই মর্ত্যে
মর্ত্য ছাড়া কোথায় গাঁজা, সিদ্ধি, ভাঙ পার বর্তে।।

With Best Compliments From :--

A
WELL
WISHER
PROVAS MONDAL

মা সারদামণি দেবী

শ্রেয়াশ্রী সিন্‌হা

মাতৃত্বের, কলিযুগে অসাধারণ প্রতিমূর্তি তুমি,
প্রকৃত মাতার, উল্লেখযোগ্য উপমা, তোমারে নমি।
ত্যাগের সরলতার মহান প্রতীক, মনুষ্যত্বের খনি,
বিশ্ব জননী হয়ে ওঠার সবগুণ, তুমি প্রকাশিলে মানি।
তোমায় স্নেহ-মায়া-মমতা-বিশ্বাস ভালোবাসার সাগর।
অফুরন্ত - সাবলীল, সে উদাহরণই রাখলে তো বারবার।
কঠিন আরাধনায় জীবনকে সামিল একান্তই করেছিলে,
মিথ্যা তো নয়, বাড়া বলা তো নয়, প্রমাণ-পদে পদে দিলে।
সত্যিকারের মা হয়ে সবার সাধ আশা পূর্ণ করলে,
মহাজীবনের জয়গান স্বাচ্ছন্দেই স্বস্তিই তো শোনালে।
দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে এ জগতে নিদর্শন গড়লে,
মহাশান্তির ক্ষমার বার্তা সমগ্র জগতে অবাধে বিতরিলে।
তোমার মুখ নিষ্কাশিত বাক্য, বাণী হয়ে সমাদৃত হলো,
জীব কল্যাণে তা সমাদর লাভ করে, দিগন্ত উদ্ভাসিত করলো,
অমৃত কথা মানব মুক্তির দিশা হয়ে পরিচয় পেলো,
যা সমগ্র জগতে আজ মহা আধ্যাত্বিক তরঙ্গে জমালো,
তুমি, সেই শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সুযোগ্য মহৎ গিন্নী হও,
তুমি, নরেনের সেই জগৎ মাতা নিশ্চয় রূপেই রও,
শ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের সবার জননী, তুলনা তোমার নেই,
তুমি আদরিণী মা আমাদের রক্ষা করো দুঃখ হতেই।
আর্ত পাপী-তাপীর উদ্ধারে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলে,
মা সারদা দেবী তুমি সবার দায়িত্ব নিলে।
তুমি মাতা নয়, জগৎ জননী হয়ে সম্মুখে এলে,
সব সন্তানে মুক্তি দিতে, নিজের অভয়বাণী শোনালে।

NVD সোলার লিমিটেড

প্রো ঃ তাপস মন্ডল

টর্চ, লন্ঠন, মোবাইল চার্জার, কুকার সহ সোলার সমস্ত রকম জিনিস পাওয়া যায়

মাসিক ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে বুকিং করা হয়

ফোন নং - ৯৮৭৪৪৪৭৭৭১
৮৪২০১৯৫৪৩৪

ভাবনা

বিভা হাজরা

সবাই আমরা বাঁচতে চাই, মরতে তো নয়,
তবু কারো নিরাপত্তা নেই, সদাই রয় ভয়!
কে কাকে মারবো ল্যাং - সেটাই ভয়ংকর,
হিংসা - বিদ্বেষে মন ভারাক্রান্ত হয় বিস্তর।
নিজের স্বার্থেই মশগুল, আর কিছু ভাবি না,
সামাজিক দায়বদ্ধতার - কোন ধার ধারি না।
সবই জাহান্নামে গেলেও - সংকীর্ণতা থাক,
নিজের গুণের ঢাক পিটিয়ে - বাজার করি মাত।
সমস্যার পাহাড় সরাতে - দ্বিধা রাখি অতিশয়,
কে মরলো, কে বাঁচলো - ভাবার কই সময়?
দেশটাকে এমনি করে - পরিত্যক্তই করি,
প্রজন্মকে সেই আঁধারেই বেশ ঠেলে ধরি।
তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে, সুখ স্বপ্নের জালই গড়ি,
আমার আত্মজরা সব হবে - আহা মরি মরি।
ভাবনা সবই এমন করেই, অন্যেরে দিই ফাঁকি,
অক্ষমতা বাড়াই, মনুষ্যত্বে আগুন জ্বেলে দূরে দূরেই থাকি।

জীবন মৃত্যু

চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

মৃত্যুর মিছিলে দাঁড়িয়ে
জীবনের রং ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে লাগে
আমি যে নারীকে ভালবেসে বেঁচে ছিলাম
সে চলে গেছে তিনদিন আগে
এখন কার জন্যে বেঁচে আছি
নিঃশব্দ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম
দৃষ্টি ফিরে ফিরে আসে চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে
পশ্চিমের দেওয়ালে একটি টিকটিকি
তাড়া করেছে একটি পোকাকে
পোকাটা বাঁচতে চায়, টিকটিকিটা খাদ্য চায়
শেষ পর্যন্ত পোকাটাই জিতল।
পূর্ব দিকের দেওয়ালে চেয়ে দেখি
সুমনার দুটি ছবি ক্যানসার ধরা পড়ার আগের এবং পরের
সুস্থ মুখটা বলছে, তুমি বেঁচে থাকো
রুগ্ন মুখটা বলছে , আমাকে বাঁচাও।

সত্যি বলো আমার বাবা কে

উত্তম কুমার পাল

জ্ঞান হয়ে অবধি বিপ্লব তার মাকে একই রকম অবস্থায় দেখে আসছে অথচ আর সবার মা এরকমটা নয়। অবশ্য এজন্য তার মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি কেননা তার মায়ের মত চেহারার মা সে আরও দেখেছে। ঐতো শিবানীর মা, কুন্তলের মা ওরাও তো বিপ্লবের মায়ের মতই। শিবানীরা চার বোন দু' ভাই শিবানী ছোটো। শিবানীও বিপ্লবের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। আবার কুন্তল! সেও তো কুন্তলদের সঙ্গেই পড়ে। কুন্তলের বোন নেই, ওরা তিন ভাই। বিপ্লব একা তার ভাই বা বোন কেউ নেই।

তবে হ্যাঁ বিপ্লবের মায়ের মত রমেশের মা নয়। রমেশের মায়ের সঙ্গে বিপ্লবের মায়ের কিছু তফাৎ আছে। বিপ্লবের মা নিরাভরণা একমাত্র পরনের পোষাক ছাড়া শরীরে কোন অলংকার নেই। এমনকী সিঁথিতে সিঁন্দুরের চিহ্নও নেই। আজকাল অবশ্য শহর ঘেঁষা অনেক মেয়েই সিঁথিতে সিঁদুর রাখা পছন্দ করছেন না। বিপ্লব, রমেশ কি শিবানী বা কুন্তল এরা কেউই শহর এলাকার ছেলে নয় বরং শহর থেকে অনেকটা দূরেই এরা বসবাস করে এমনি কী ওদের কারও মামার বাড়ি শহর বা আধা শহরেও নয়। তবু কুন্তল বা শিবানীর মায়ের কপাল বা সিঁথিতে সিঁদুর না থাকলেও হাতে সোনার চুড়ি দু-এক গাছা আছে তবে শাঁখা নেই আসলে এই তিন মা-ই বিধবা অর্থাৎ এদের কারো স্বামী নেই। সেই জন্যই বিপ্লবের মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন জাগেনি। রমেশের মায়ের শাঁখা সিঁদুর নোয়া চুড়ি সবই আছে। রমেশও তার মায়ের এক সন্তান। রমেশের বাবা আছে। এভাবে বেশির ভাগ মা-ই রমেশের মায়ের মতই। তারা অনেকেই স্কুলে আসে।

বিপ্লবের দুঃখ একটাই সে তার বাবাকে কোনদিন দেখেনি। হয়তো তার জন্মের আগেই বাবা মারা গেছে। বিপ্লব সঠিক জানেনা কি কারণে তার বাবা মারা গেছে তবে কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছিল যে জন্য তার বাবা তার জন্মের আগেই মারা গেছে। কথায় কথায় বিপ্লব শুনেছে শিবানীর বাবার কথা। দূরে কোন কারখানায় কাজ করত। কোন এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কুন্তলের বাবা কোন কঠিন অসুখে মারা গেছে। কিন্তু বিপ্লবের বাবা কীভাবে মারা গেছে তা সে জানে না। মায়ের দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করার কথা ভাবেনি বিপ্লব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ হবার পরে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য যে সার্টিফিকেট পেয়েছে তাতে তার বাবার নামের পাশে শ্রী টা নেই যা অনেকের বাবার নামের পাশে আছে। সে দেখেছিল শিবানীর বাবার নামের পাশেও শ্রী টা নেই। সে বুঝে গিয়েছে যাদের বাবা থাকে না তাদের নামের পাশে শ্রী না থেকে চন্দ্রবিন্দুর থাকে এটা না কি মারা গেলে লেখা হয়। বিপ্লবের বাবার নামের পাশে শ্রী বা চন্দ্রবিন্দু কোনটাই নেই তাহলে ব্যাপারটা কি? অথচ সে জানে তার বাবা মারা গেছে।

বিপ্লব এখন একেবারে সেই ছোটটি নেই। এখন সে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তার বোধ বুদ্ধি বেড়েছে। এখন সেই একদিনের জেগে ওঠা প্রশ্নটা আবার তাকে ভাবায়। তার মায়ের তো বয়স বেশি নয় তাহলে তার বাবাটাও নিশ্চয় বুড়ো হয়ে মারা যায় নি। তবে কেমন করে মারা গেল? কোন একসিডেন্ট না কি কঠিন অসুখ কিছু করেছিল? কই মা তো কোনদিন তাকে কিছু বলেনি। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছু জিজ্ঞেস করতেই পারেনি কিন্তু সে জানবে না-ই বা কেন? শিবানী বা কুন্তল ওরা তো জানে ওদের বাবা কীভাবে, কেন মারা গেছে। তাহলে তারও তো জানা উচিত। মা নিশ্চয় বলতে পারবে। যেমনি ভাবা অমনি সে ছুটল মায়ের কাছে। মাকে জিজ্ঞেস করল 'মা, তুমি নিজের থেকে আমাকে কোনদিনই বলনি আমার বাবা কী করে মারা গেছে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে বাবার কী হয়েছিল যে এতো তাড়াতাড়ি মারা গেল।'

ছেলের কথা শুনে মনোরমা কেমন যেন চমকে উঠল। যে বিষয়টা সে ছেলের কাছে কোনদিন প্রকাশ করেনি সে প্রশ্নটা আজ করে বসল। এর কী উত্তর দেবে মনোরমা। উত্তর দেবার মত উত্তর জানা থাকলেও আসল সত্যটা সে কেমন করে প্রকাশ করবে ছেলের কাছে। মনোরমার মুখের ভাব বিপ্লবের চোখ এড়ায়নি। মনোরমা সেটা খেয়াল না করেই বলে বসল বিপ্লব আজ পড়তে যাবি না?

— যাবো তো, কিন্তু মা আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি তার উত্তরটা দিলে না।

— না, মানে সে সব জেনে আর কী করবি বল।

— জানলে ক্ষতি কী মা? শিবানীর বাবা কী করে মরেছে সেটা সে জানে। কুন্তলের বাবা কী করে মরেছে সেও সে জানে। শুধু আমিই জানিনা আমার বাবা কী করে মারা গেল।

মনোরমা তবুও প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করে বলে, 'খোকা সময় হয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে স্যার বকবে, পড়তে চলে যা। পরক্ষণেই মনোরমা কেমন যেন উদাসী হয়ে যায়।

-- বিপ্লব জিজ্ঞেস করে, বাবা খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে তাই না মা? আমি জিজ্ঞেস করলুম বলে তোমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল? আচ্ছা ঠিক আছে তোমার যেদিন মন ভালো থাকবে সেদিন বোলো।

আমার কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছা করছে। আজ না হয় পড়তে চলে যাচ্ছি।

বিপ্লব পড়তে চলে গেল। মনোরমার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে সে কেমন করে বলবে যে তার বাবা মারা যায়নি আজও বেঁচে আছে এবং তার কাছাকাছিই আছে। কতদিন বিপ্লবের কাছে আসল কথা লুকিয়ে রাখবে। বিপ্লব একদিন আসল সত্যটা জানবেই সেদিন কি কৈফিয়ত দেবে। মনোরমা কি করবে আর ভাবতে পারে না। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে অতীতের সব ঘটনাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে অথচ মনোরমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যে কলঙ্ক মুছবার নয়, ভুলবার নয়।

বেশ ক'দিন কেটে গেল। বিপ্লব আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আসলে মায়ের দুঃখী মুখটার দিকে তাকালে সেও কেমন যেন হয়ে যায়। কত স্বপ্নই না দেখে সে বড়ো হয়ে তার মায়ের দুঃখের সংসারে সুখ ফিরিয়ে আনবে। বাবাটা কম বয়সে মারা গিয়ে তার মাকে কতটা দুঃখ কষ্ট করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে কত ঘটনার কথাই না শোনে। রাজনৈতিক দলাদলিতে কত লোক অকালে মারা গেছে। বিপ্লবেরও কেমন যেন মনে হয় তার বাবাও তেমন কোন অঘটনের মধ্যে দিয়ে মারা গেছে।

একদিন সে তার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিল তার বাবা কী করে মারা গেছে। দিদিমা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বলেছিল ''সে অনেক কথা অত আমি বলতে পারবুনি তোর মাকে জিজ্ঞেস করিস।'' তাইতো বিপ্লবের কেমন যেন সন্দেহ হয় তবে কি তার বাবাকে কেউ মেরে দিয়েছে? সত্যিই যদি তাই হয় তবে তা জানতে হবে কে বা কারা তার বাবাকে মেরেছে, কেনই বা তারা মারল। বাবার খুনির বদলা নিতে হবে। এমনি নানান ভাবনা বিপ্লবকে অস্থির করে তোলে।

সেদিন বিপ্লবের স্কুলে কেমন একটা ঘটনা ঘটে গেল। সে ভাবতে ও পারেনি এমন একটা ঘটনার সামনে তাকে হাজির হতে হবে। সুজিতবাবুর ক্লাস চলছিল সে সময় বাইরের একজন লোক এলেন, তাকে বিপ্লব চেনে। এর আগে সে লোকটাকে অনেক বার দেখেছে। লোকটা অঞ্জনার বাবা এটাও সে জানে আবার এটাও সে জানে অঞ্জনার বাবার নামের সঙ্গে তার বাবার নাম মিলে গেছে। শুধু অঞ্জনার বাবা বেঁচে আছে আর বিপ্লবের বাবা মারা গেছে। সুজিতবাবু দেখিয়ে বিপ্লবকে জিজ্ঞেস করলেন বিপ্লব তুমি ঐ ভদ্রলোককে চেনো?

সাগ্রহে বিপ্লব উত্তর দিল হ্যাঁ স্যার ও তো অঞ্জনার বাবা।

— তোমার বাবার নামও তো একই তাই না?

— হ্যাঁ স্যার, বলেই বিপ্লবের মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল।

পরক্ষণেই হেড স্যারের সঙ্গে ভদ্রলোক বিপ্লবদের ক্লাসে এলেন। হেড স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনার মেয়ে এই স্কুলে পড়ে তাই না। আপনার ছেলেও কি এই স্কুলে পড়ে।

— আমার ছেলেতো ছোটো স্যার, সে তো সবে প্রাইমারীতে ভর্তি হয়েছে।

— আপনার মেয়ের নাম তো অঞ্জনা হালদার, তাহলে বিপ্লব হালদার কে? বাবার নাম তো একই দেখছি।

— বিপ্লব হালদার ? নামটা শুনেই একটু চমকে উঠলেন যেটা স্যারদের চোখে এড়াল না। সুজিতবাবু বিপ্লবকে দাঁড়াতে বললেন। বিপ্লব দাঁড়ালে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা আপনি এই ছেলেটিকে চেনেন'?

- ভদ্রলোক, মানে অঞ্জনার বাবা এক পলক বিপ্লবের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, কই না তো, আমি তো একে চিনি না।

— হেড স্যার বললেন, ভুল বুঝবেন না আসলে ছেলেটির গ্রামের নাম আর বাবার নাম একই দেখে আমরা ভেবেছিলাম হয়তো আপনারই যমজ ছেলেমেয়ে হতে পারে তাই জিজ্ঞেস করলাম। ঠিক আছে আপনি এখন আসুন।

স্যারেদের অনুমান যে মিথ্যা নয় তারাই আগেই জেনে গেছেন। সত্য উদ্‌ঘাটন করতে, সন্দেহের নিরসন করতে এই পথ নিলেন কিন্তু ভদ্রলোক স্বীকার করলেন না।

বিপ্লবের মনে আবারও সন্দেহ দানা পাকাতে লাগল। বারবার মনে প্রশ্ন জাগে বাবা মারা গেছে কিন্তু কি ভাবে, কবে কেন সে প্রশ্নের উত্তর সে পায়নি। তার মাকে জিজ্ঞেস করেও উত্তর পায়নি। একই গ্রামে বাস করে অঞ্জনার বাবা, তার বাবার নামের সঙ্গে মিল অথচ অঞ্জনার বাবা তার বাবা নয় যদি তা হত তবে তো একই বাড়িতে থাকত অঞ্জনাও, তার দিদি বা বোন হত। অঞ্জনার মা কি মারা গেছে? অঞ্জনার বাবা যদি তার বাবা হয় তবে কি তার মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কই তেমন কথা তো সে তার মার কাছ থেকে কোনদিন শোনেনি। বাবা মারা গেছে এটাই শুনেছে। যদি ওটাই তার বাবা হয় তাহলে মা না বলুক দিদিমাতো অন্তত: বলতো! বিপ্লব এতো কিছু ভাবতে পারে না। আসল রহস্যটা আজ তার মাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে। তাতে তার মা যত কষ্ট পায় পাবে। আর সত্যি যদি অঞ্জনার বাবা তার বাবা হয়ে থাকে তবে ঐ লোকটাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে কেন সে তার মাকে অত কষ্ট দিচ্ছে।

- না বিপ্লবের আর তর সইছে না। সে ইস্কুল থেকে ফিরে হন্তদন্ত হয়ে মায়ের কাছে গেল মনের মধ্যে জেগে ওঠা প্রশ্নের অবসান ঘটাতে।

বিপ্লবের মা তখন মাঠের ধারে কাজ করছিল । ছেলেকে ওভাবে আসতে দেখে শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, তুই এত ব্যস্ত হয়ে এভাবে মাঠে চলে এলি কেন? স্কুলে কিছু হয়েছে?

- না মা তেমন কিছু নয় তবে.....

— তবে কি বল! থেমে গেলি কেন, স্যারেরা মেরেছে?

— না মা তাও নয়। আজ তোমাকে একটা কথার উত্তর দিতে হবে।

— কী হয়েছে, কি কথা আমি তো লেখাপড়া করিনি আমি কি উত্তর দেবো।

— আমি যে প্রশ্নের উত্তর চাইছি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে লেখাপড়া লাগে না মা।

মনোরমার বুকটা ধড়াস করে উঠল তাহলে কি এমন প্রশ্ন! তবে কি সেই প্রশ্নের যেটার একদিন সে উত্তর পায়নি? যদি তাই হয় তবে কি জবাব দেবে? কিন্তু ছেলের যে উত্তেজিত ভাব তাতে তো আর উত্তর না দিয়েও কোন উপায় নেই। স্কুলে কি এমন ঘটল? নিজের মনকে শক্ত করে নিল। না, ছেলে বড়ো হচ্ছে একদিন সে জানবেই। তাকে আর লুকিয়ে রাখা যাবে না সে আজকেই তার সত্যটা বলে ফেলবে। ওদিকে ততক্ষণে অঞ্জনার বাবা একটু দূর দিয়ে আসছে তা দেখতে পেল মনোরমা। বুকটা আরো জোরে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

— মা, সত্যি করে বলতো আমার বাবা কি সত্যিই মারা গেছে। যদি মারা গিয়ে থাকে তবে কবে কী ভাবে মারা গেল।

মনোরমার ডান হাতটা ততক্ষণে কিছুটা উঁচু হয়েছে আর তার তর্জনীটা নির্দেশ করছে অঞ্জনার বাবার দিকে।

— বিপ্লব সেদিকে তাকিয়ে কিছুতেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারছে না শুধু চিৎকার করে উঠল, মা!

বিপ্লব ভাবতে থাকে স্যারের কথা, তবু লোকটা অস্বীকার করল কেন? কী ভাবে সেদিকে ছুটতে যাচ্ছিল তার মা তাকে বাধা দিল। বলল, থাক বাবা থাক আজ ফিরে আয়। সে অনেক কথা একদিন সব বলব। সময়ে ওকে স্বীকার করতেই হবে।

ছন্দবাণী

মানবতার মিছিলে

সেখ গুলজার হোসেন

মানবতার বাতাস যেখানে বয়ে যায়
সেখানে তুমি। শুভ্র কাঞ্চনের
কুঁড়ি হয়ে উঁকি দাও
হাজার হৃদয়ে। দরজা খুলে
অন্য জগতের আস্বাদন
পৌঁছে দাও যখন .....
তখনই পেছনে বিশাল মিছিল।
দৃঢ়তায় অঙ্গীকারে আঁটোসাঁটো
বুক। মৃত্যুকে 'থোড়াই-কেয়ার'
বাঁচার লড়াই-এ মৃত্যুর প্রশ্নকে
উড়িয়ে দিয়ে - মুষ্টিকে মজবুত করে
ধরে আছো পতাকার খুঁট।
মানবতার বাতাসে পতপত করে
আকাশ ভেদে-উড়ছে পতাকা।
পদধ্বনিতে বাতাস মুখরিত,
মানবতার মিছিলে।

আমি

প্রতিম চ্যাটার্জী

বাড়ি আমার বাড়াবাড়ি
ভাঙ্গল আমার ভাতের হাঁড়ি,
সংসার হল পায়ের বেড়ী
সব কিছু আজ জলাঞ্জলি।।
দিনে ভাতের থালা ভয় দেখায়
বলে কাল থেকে আর আসব না হেথায়।
রাতের খাবার পদ্য লেখায়
অখাদ্য খাদ্য খেতে তুমি বাধ্য।
আগে ছিলাম বাধ্য
এখন ক্রমে হচ্ছি বৃদ্ধ।
এরপর হব বধ্য
দূত অবধ্য।।

আত্মীয় পাখিরা

তমশ্রী দাস

কাকতুয়া হল কাক
ময়না কি পিসিমা
চন্দনা, দিদি হলে
কে হবে মাসিমা?
শকুনি যে মামা ছিল
সে কি এই শকুনই
মাছরাঙা জেঠু হলে
বাবা দেবে বকুনি
ফিঙে পাখি ভাগ্নে কি?
টুনটুনি ভাইঝি
কোন পাখি হবে দিদা
কোন পাখি মাইজি।

হাওড়ার ইতিহাসে ঐতিহাসিক সুভাষচন্দ্র

অনুপম মুখোপাধ্যায়

তখন গান্ধী পুণ্যাহ পালন হতে শুরু হল হাওড়ায়। সতেরতম গান্ধী পুণ্যাহ উপলক্ষে হাওড়া টাউন হলে ২৩শে আগষ্ট ১৯২৩এ আয়োজিত সভায় সুভাষচন্দ্র বললেন শ্রমিকদের সংগঠিত করার কথা। এই শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করা, তাঁদের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করাও অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। ঐ বক্তব্যে সুভাষচন্দ্র আরও উল্লেখ করলেন দু'বছর আগেই এই অঞ্চলের শ্রমিকদের একটা বড় অংশ বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতে পিকেটিং করেছিল।

এই সুভাষচন্দ্রই ২৯২১এর জুনের শেষে ব্রিটিশ ভূখন্ড ত্যাগ করে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। আসার আগেই দু'টি চিঠি লিখে দাদা শরৎচন্দ্রকে জানিয়ে এলেন ২৬শে জানুয়ারী ১৯২১এ যে তাঁর পক্ষে ICS হয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির অংশ হতে পারা যাবে না আর ঐ বছরই ১৬ই ফেব্রুয়ারী লিখলেন তাঁর পক্ষে অরবিন্দের পথটাই চিত্তাকর্ষক রমেশচন্দ্র দত্তের পথ নয়। যাই হোক এহেন সুভাষচন্দ্রকে যাঁরা প্রাথমিকস্তর থেকেই গান্ধী বিরোধী শিরোপা দিতে বেশী আগ্রহী তাঁদের স্মরণ থাকা ভালো ১৬ই জুলাই ১৯২১এ মুম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে সেই দিনই বিকাল বেলা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। এই হল সুভাষচন্দ্রের সামান্য পরিচয় হাওড়ায় তাঁর উপস্থিতির আগে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রয়াত হন ১৯২৫ এর ১৬ই জুন। হাওড়া টাউন হলে স্মরণ সভা। সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে উঠে কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তৎক্ষণাৎ সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন উঠে দাঁড়িয়ে আর যোগ করলেন 'আজ দেশের বিয়োগ ব্যথা সুভাষের চোখে'।

সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ১৯২৮ এর ২১শে জুন লিলুয়ায় ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের পক্ষে প্রচার করলেন পাশে দাঁড়িয়ে যে এদের সবরকম সাহায্য করা দরকার কারণ বিনাশর্তে এরা আত্মসমর্পণ করলে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে। কোন মতেই রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দেওয়া চূড়ান্ত অসম্মানজনক শর্ত মানতে রাজি হওয়া উচিত নয়। তার আগে ১৯২৮ এর ২১শে এপ্রিল সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন লিলুয়ার শ্রমিকরা যখন ৪২দিন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময়ে।

সুভাষচন্দ্রকে ১৯২৪এ তখনকার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ও নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে অবশেষে তাঁর মুক্তি লাভ ঘটে। তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১৯২৮এর ২৫শে জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় হাওড়া টাউন হলে সদ্য কারামুক্ত রাজবন্দীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অন্য রাজবন্দীরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র নাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিবপুরের প্রবোধচন্দ্র বসু। রাজবন্দীদের অভিনন্দিত করেন কিন্তু স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পূর্বেই জানা গেছে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ১৯২৮ এর ধর্মঘটের কথা। স্বাধীনতার আগে এই ধর্মঘট অনেকদিন থেকেই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। প্রাথমিক অংশে এই আন্দোলন এই ধর্মঘট কিছুটা দমনপীড়ন মূলক ছিল ও ধর্মঘটীদের মধ্যে বিভ্রান্তি হতাশা প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল। সমসাময়িক ভাবে কিছুটা পিছিয়ে যায় এই ধর্মঘট আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে। তাই ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৯তে লিলুয়া ময়দানে, এখন যে মাঠটি ঘেরা ও ফুটবল খেলা এবং RPF এর কুচকাওয়াজের জন্য ব্যবহার করা হয় সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থেকে ঐ শ্রমিকদের সমাবেশে বোঝানোর চেষ্টা করেন সংঘবদ্ধতার অভাবের কারণেই প্রাথমিকভাবে ব্যর্থতা ঘটে। সংঘবদ্ধতার শক্তি ব্যতীত দাবী আদায় সম্ভব নয়। ঐ বছরই ১৬ই আগষ্ট শ্রমিকদের সমাবেশে ঐ ময়দানেই সভাপতির ভাষণে তিনি তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বোঝানোর চেষ্টা করেন পুনরায় যে-স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গেও এই শ্রমিক আন্দোলনের ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই আন্দোলনের ন্যায্য দাবীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে সারা বিশ্বে পাঠাতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি তখনই স্মরণ করান যে কর্ত্তৃপক্ষের উস্কানিমূলক প্ররোচনায় যে ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠিত হয়েছে তাঁর ফাঁদে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শ্রমিকরা পা না দেন। পাশাপাশি সতর্ক করেন ঘন ঘন ধর্মঘট না করে গুরুতর শিল্পবিরোধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পন্থা রূপে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া উচিত। প্রথম কর্ত্তব্য ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় করা ও স্থায়ী ভিত্তির উপর তাকে প্রতিষ্ঠা করা। আবার ঐ ১৯২৯ এর ১৩ই সেপ্টেম্বর তখনকার উন্মুক্ত হাওড়া ময়দানে হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। নেতৃত্ব ছিল সুভাষচন্দ্রের। সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। সুদূর পাঞ্জাব থেকে আসেন ডাঃ আলম। অন্যন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রবোধকুমার বসু, গুরুদাস দত্ত, হাওড়া

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বরদাপ্রসন্ন পাইন ও এ্যাসেসর বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সম্মেলন চলাকালে সংবাদ আসে যতীন দাস অনশনে মারা গেছেন। বিপ্লবীর দেহ আসছে রাখা হবে হাওড়া টাউন হলে। আমরা অনেকেই অবগত আছি পরের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর এক মহামিছিল নিঃশব্দে অনুসরণ করেছিল বিপ্লবীর মরদেহর সঙ্গে কেওড়াতলা পর্যন্ত।

পুনরায় ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯শে ঐ হাওড়া ময়দানেই অনুষ্ঠিত হয় জেলার আরও একটি রাজনৈতিক সম্মেলন। সভাপতির অভিভাষণে অসহযোগের মূলনীতি সম্পর্কে বলেন আমলাতন্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে জনতাকে সংঘবদ্ধ করে যে সহায়তা ও সহযোগিতার উপর ব্রিটিশ রাজশক্তি দাঁড়িয়ে আছে তার ভিত্তি একেবারে ধ্বংশ করে দেওয়া। এটি তাঁর অন্যতম দীর্ঘ বক্তৃতা ছিল। তিনি আরও বলেন যদি তরুণ সমাজকে শৃঙখলাবদ্ধ করে কর্মক্ষেত্রে নামান যায় তা হলে দলাদলির বীজ চিরকালের মত বিনষ্ট হবে, ভারত আবার স্বাধীন হবে অচিরেই।

এরপর আরও দুটি জনসভাতে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, সুবিবেচনা প্রসূত ভাষণ আমাদের আকৃষ্ট করে এখনও। যেমন ১৯৩০এর জানুয়ারী মাসে হাওড়ার ক্ষীরেরতলা ময়দানের জনসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সভাতে তিনি ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে দিতে বললেন স্বনির্ভরতার জন্য কোন না কোন একটি বিষয় অবলম্বন করে। ইঙ্গিত ছিল এমন একটি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করার যা দেশজ কাঁচামাল সংগ্রহ করে তৈরি করা যেতে পারে। পরের জনসভা হয়েছিল সাঁকরাইলে। এখানেই তিনি সরাসরি বলেন নারীরা ও অনুন্নত শ্রেণীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি যোগ না দেন তবে এ স্বাধীনতা সংগ্রাম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যথার্থ শক্তি বৃদ্ধি হবে না। এখানে দু'টি বিষয় গবেষণার অনুসারী। এক ক্ষীরেরতলার ময়দানের বেশ কয়েকমাস পরে গান্ধীজীর ডান্ডি অভিযান সংগঠিত হয় লবণ আইন অমান্যকে সম্বল করে ও বঙ্গ নারীরা এরপর হাজারে হাজারে সামিল হন বিভিন্ন আন্দোলনের অভিমুখে। স্মরণীয় ডান্ডি অভিযান শুরু হয় ১৯৩০ এর ১০ই মার্চ। সাঁকরাইলের সভা হয়েছিল ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩০। এরপর সুভাষচন্দ্রের সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল অনেকটা সময় পরে সেই ১৯৩৯এর ৮ই হাওড়ার বেলিলিয়াস পার্কে। সেখানেই 'নতুন দল' গঠনের মধ্যে দিয়ে শীঘ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের ডাক দেন এবং আগামী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আরও প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করেন সবাইকে। এই প্রস্তুতির আবহ যেন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে যায় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে বলেন। ফলে কংগ্রেসের সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী শক্তি ও প্রগতিশীল শক্তি একত্রিত হয়ে এক চরম রূপ ধারণ করবে।

এরপর ইতিহাস সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিকে ঘিরে নয়, তবুও সর্বত্র 'সুভাষময়' সেইসব কার্যকারণগুলো।

হাওড়ার হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত আস্থাভাজন। হরেন্দ্রনাথ হাওড়া জেলায় এমনভাবে আন্দোলন সংগঠিত করতেন যে সুভাষচন্দ্র প্রায়ই বলে ফেলতেন 'হাওড়া আমার কেল্লা'। হাওড়ার গ্রামে কিষাণ আন্দোলন চালাতে চালাতেই গ্রেপ্তার হলেন হরেন্দ্রনাথ। তিনি কারাগারের অন্তরালে চলে গেলে ফরোয়ার্ড ব্লকের কাজকর্ম গোপনে চালাতে থাকেন শিবপুরের সুশীল মুখোপাধ্যায়, শালিখার ইন্দু মুখোপাধ্যায়, সাঁত্রাগাছির ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য, মধ্য হাওড়ার অধ্যাপক ডঃ মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, সুহৃদ বিশ্বাস ও উলুবেড়িয়ায় আত্মগোপনকারী নানু ঘোষ প্রমুখ।

৫ই মে ১৯৪০ সালে বাগনানে সভায় বক্তৃতারত সুভাষচন্দ্র

এল ১৯৪৫। আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন একটি স্পন্দন, একটি অনুভব, অকটু আবেগ। এই ১৯৪৫ এই হাওড়ার বার্ন, গেষ্টকিন উইলিয়মস প্রভৃতি কারখানার প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে একদিনের। সেই দিনই ৩,০০০ শ্রমিকের মিছিলেরও উল্লেখ পাই পুরানো পুলিশ আই.বি. রিপোর্টে। এই বছরের শেষের দিকে কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল, উঠল না ফরওয়ার্ড ব্লকের উপর থেকে। হরেন্দ্রনাথকে মুক্তি দেওয়া হলেও তিনি গোপনে সংগঠন চালাতে থাকেন। ১৯৪৬এ শরৎ বসু কংগ্রেস ছাড়লেন। কিন্তু সেই সময়েই অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে নেতাজীর জন্মদিন পালন করা হল হাওড়া টাউন হলে। অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য পতাকা উত্তোলন করলেন, সভাপতিত্ব করলেন জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। এরপর ১৯৪৬এর ২৫শে জানুয়ারী হাওড়া ময়দানে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মেয়র শাহনওয়াজ খানকে বিরাট সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হল। হাওড়া মিউনিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শৈলকুমার মুখার্জী সংবর্ধিত করলেন মেজরকে। ইতিমধ্যে হরেন্দ্রনাথ কিন্তু নবরূপে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনে নেমে পড়েছিলেন। বহু ছাত্র যুবক এগিয়ে এলেন তৈরি হল আজাদ হিন্দ দল, রাণী ঝাঁসি বাহিনী প্রভৃতি। স্থানীয় জাতীয়বাদী ক্লাবগুলো যেমন সেবা সংঘ, হাওড়া সংঘ, অন্নপূর্ণ ব্যায়াম সমিতিরা প্রায় আধা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন সেখানে ইতিমধ্যেই হাওড়া এ্যাসেমব্লী ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আগেই প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যান্ডবাদন শিখতে শুরু করে দিয়েছিল।

নীল স্বর্গ

এস. কে মেহবুব

হোটেল ক্যুইন, কোলকাতা উত্তরের এক নাম করা বার কাম রেস্টুরেন্ট। বাইরে লেজার লাইটে উজ্জ্বল অক্ষর লেখা 'এনজয় উইথ লাইভ ব্যান্ড' অর্থাৎ সিংগিং বার। গেটের সামনে কালো ইউনিফরম পরে এক সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে। একে একে অতিথিরা যখন বারের ভিতরে ঢোকে, তাদের প্রত্যেককে গার্ডটি স্যালুট করে অভিবাদন জানায়। ভিতর থেকে অতিথিরা বেরিয়ে আসার সময় পঞ্চাশ একশো টাকা গার্ডটির হাতে গুঁজে দেয় বকশিস হিসেবে। বারটির ভিতরের একদিকে একটা উঁচু স্টেজে সারিসারি বসে আছে বিভিন্ন পোষাকের বার সিংগাররা। তাদের মধ্যে একজন নোটেশান স্ট্যান্ডের উপর একটা খাতা রেখে গেয়ে চলেছে 'ডার্লিং তেরে লিয়ে'। হ্যাঁ এ জামানার সুপার হিট গান। তার তালে তালে যন্ত্র শিল্পীদের যন্ত্রগুলো সুর মিলিয়ে চলেছে। বারটিতে ব্যবহৃত আলোগুলি তাদের ঘন ঘন রঙ পাল্টে রশ্মি আকারে মেয়েগুলির শরীর ছুঁয়ে যায়। সামনের টেবিলগুলিতে বসে থাকা অতিথি ভদ্রলোকগুলো বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে ডান হাতে ধরা রঙিন জলের গ্লাসটি ছুঁইয়ে দেয় দুই ঠোঁটের ফাঁকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা লোলুপ দৃষ্টি মেয়েগুলির শরীরের বক্ষ থেকে উরু পর্যন্ত সমস্ত খাঁজগুলির মধ্যে একটা কিছু অন্বেষণ করে বেড়ায়, তার ফাঁকে ফাঁকে একটা দুটো নোট সংযোগকারীদের মাধ্যমে চলে আসে মেয়েদের হাতে। এটা অবশ্য অতি পরিচিত দৃশ্য মেয়েরা পরপর উঠে আসে গান গাওয়ার জন্য। তাদের মধ্যে একজনের নাম রিংকি, এটা অবশ্য তার হোটেলি নাম। আসল নাম স্বপ্না। অন্যান্য বারাঙ্গনাদের মতো সন্ধ্যার পর অতিথিদের মনোরঞ্জন করার জন্য মুখে রঙ মেখে আঁটো সাটো পোষাকে মাততে হয় অনিচ্ছুক অনুশীলনে। কাজ শেষে নিজের পাওনাটা বুঝে নিয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ী। কোনো কোনোদিন ব্যান্ড মাস্টারের গাড়ীতেও যেতে হয়। আবার সেই গাড়ীতে বসেও সেল ফোনে অতিথিদের সঙ্গে মিথ্যা প্রেমালাপ সারতে হয়। বহু ক্ষেত্রে অপর প্রান্ত থেকে শুনতে হয় অশালীন কথাবার্তা ও কুপ্রস্তাব। এসবই হজম করে মিথ্যা প্রেমের জালে জড়িয়ে ধরে রাখতে হয় ওদের। কারণ আগামী দিনের পশরা পাততে হবে। নোংরা হলেও ওদের দেওয়া টাকাতেই তো সংসার চলে। গাড়ীটা এসে দাঁড়ায় পাড়ার এক সরু রাস্তার মোড়ে তারপর পায়ে হেঁটে বাড়ী, বাড়ীতে তখনো কেউ না কেউ জেগে আছে রিংকির অপেক্ষায, রিংকির ডাকে সাড়া দিয়ে দরজা খুলে দেয়। বাড়ীতে ঢুকে পোষাক আশাক পরিবর্তন করে মুখে কিছু দেওয়ার পর ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয় বিছানায়। পাশে তখনও অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে মার কাছে ঘুম পাড়ানি গান থেকে বঞ্চিত বছর আষ্টেকের সন্তান নাম পুস্পিতা। পুস্পিতা রিংকির একমাত্র মেয়ে, ক্লাস থ্রীতে পড়ে। দেখতে অনেকটা বাবার মতোই। এই বাবা প্রসঙ্গ আসতেই রিংকি ভাবতে ভাবতে চলে যায় অতীতের সেই দিনগুলির মধ্যে।

খুব ছোট বয়স থেকে নাচগান শেখার উপর প্রচন্ড ঝোঁক ছিলো রিংকির। বাবা মার প্রেরণায় শুরু করেছিলো নাচের তালিম। খুব তাড়াতাড়ি এই শিল্পে দক্ষতা অর্জন করে জেলা ও জেলার বাইরে বিভিন্ন মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করে বহু মানুষের মন কেড়ে নিত। সেই সঙ্গে অনেক সুনামও অর্জন করেছিলো। বহুল প্রশংসা সহ পুরস্কার এবং অর্থ উপার্জন করত। হঠাৎ একদিন এক তবলা বাদকের নজরে আসে রিংকি। রিংকির চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল প্রতিভার আভাস। তপেসের মনে হয়েছিলো, তপেস বলতে ঐ তবলা বাদকের নাম, যে রিংকি নাচের সঙ্গে সঙ্গে গানের তালিম নিলে ও হয়ে উঠতে পারবে সঙ্গীত জগতের মন জয়করা সঙ্গীত শিল্পী, তপেসের প্রেরণায় রিংকি শুরু করেছিল সঙ্গীত চর্চা। ঐ তপেসই ছিলো ওর শিক্ষাগুরু। হাতে ধরে যত্ন সহকারে সঙ্গীতের নিয়মিত অভ্যাস চলতে থাকলো। প্রতিভাময়ী রিংকি তার প্রতিভাবলে খুব তাড়াতাড়ি সঙ্গীত জগতে একটা জায়গা দখল করে নিয়েছিলো। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো তার নাম, সুমিষ্ট কণ্ঠ আর সুন্দরী মোহময়ী মুখখানা শ্রোতাদের মনে পাকাপোক্ত ভাবে স্থান করে নিয়েছিলো। এভাবেই চলতে চলতে - তপেস ও রিংকির ছাত্রী শিক্ষকের সম্পর্কটা পূর্বরাগ হয়ে অনুরাগের গন্ডি ছাড়িয়ে ভালোবাসায় পদার্পণ করল। প্রস্তাবটা দিয়েছিলো তপেস, রিংকি প্রথমে খুব লজ্জা পেলেও পত্যাখ্যান করতে পারে নি। হয়ে গেলো প্রেমিক-প্রেমিকা। তপেসদা বয়েসে বেশ কিছুটা বড় হলেও কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ওদের দু'জনের সম্পর্কে। রিংকির বাবা মা ও আত্মীয় স্বজনদের ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা থেমে থাকেনি। সমাজের রক্ত চক্ষু শাসানি উপেক্ষা করে তারা একে অপরের সঙ্গে হারিয়ে গেছে ভালোবাসার জগতে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ চিরাচরিত অবন্ধণ অগ্রাহ্য করে তারা আবদ্ধ হয়েছিলো বিবাহ বন্ধনে। যেহেতু তপেস অব্রাহ্মণ তাই রিংকির পরিবারের ঘোর আপত্তি সত্বেও কোনো বাধাই ধোপে টেকেনি। তারা সব সময় ডুবে থাকতো ভালোবাসার সাগরে। যে ভালোবাসার ফসল হিসাবে রিংকির কোল আলো করে জন্ম নেয় পুস্পিতা। তবে সঙ্গীত চর্চা থেমে থাকেনি। বয়স তখন খুব একটা বেশি নয় পনেরো কি ষোল

হবে। খুব অল্প বয়েসেই রিংকি পেয়েছিলো মা হবার স্বাদ। অন্যদিকে রিংকির অসংখ্য ফ্যানদের মনও রাখতে হতো। বিভিন্ন পার্টিতে যাওয়া ফ্যানদের মন রাখতে তাদের পাঠানো চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া বা টেলিফোনে আলাপচারিতাও সারতে হতো। এখান থেকেই তপেসের মনে ঢুকে গেলো গভীর সন্দেহ। ওদের পবিত্র বন্ধনে এক ফাটল সৃষ্টি হল, যেটা বাড়তে বাড়তে একেবারে দু'ভাগ করে সরিয়ে দিলো একটু একটু করে গড়ে ওঠা ভালোবাসার মিনারটিকে। তপেসকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও কোন ফল পাওয়া গেল না। শুরু করে দিলো অত্যাচার নির্যাতন আরো অনেক কিছু। তবে রিংকির শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্যরা ছিলো রিংকির পাশে। তাতে আর কি হবে? অসম্ভব অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে রিংকি হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নিজেকে শেষ করে দেওয়ার। সে মনে মনে ভাবলো এই ভালোবাসা হীন পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তাই বন্ধ ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েও সে ব্যর্থ হলো। এক্ষেত্রে স্বামীই তার পরিত্রাতা। কোন মতেই তপেসকে বোঝানো গেলো না। রিংকি বোধ করতে লাগলো একাকিত্ব। তবে পুস্পিতা তখন বেশ কিছুটা বড় হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত দাদার সাহায্যে রিংকি ফিরে আসে বাপের বাড়ী, বেকার দাদা ও শ্রমজীবি বাবার সংসারে নিজেকে ভারী বলে মনে হয়েছিলো তার। তাই বাবা ও দাদাকে সাহায্য করার জন্য সে আবার সঙ্গীত চর্চাকেই বেছে নিল, তবে অন্য পথে। মেয়েকে মানুষ করতে হলে চাই অর্থ তারই সংস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলো এই পথে নামতে। যে পথে চলার সময় অনেকেই রিংকির সঙ্গী হতে চেয়েছিলো তবে তাতে ছিলো না ভালবাসা। সবটাই আবেগ মিশ্রিত মোহ, রিংকি বুঝতে পেরে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু প্রত্যাখ্যান করেছিলো। যে মেয়েটি স্বপ্ন দেখেছিলো এক সুন্দর সংসারের স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এক সুখী পরিবারের সেই স্বপ্ন আজ ভেঙে চৌচির হয়ে তার চারপাশে গড়ে উঠেছে এক মিথ্যা মেকি ভালোবাসার প্রাচীর। আর এই ভালোবাসা নিয়েই ওর দিন কাটে। যে ভালোবাসার মধ্যে নেই হৃদয়। সব কিছু মুছে গিয়ে সে আজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অন্য নামে। সে যে কারো বোন, কারো স্ত্রী, কারো মেয়ে বা কারো বন্ধু এই সব পরিচয় ঢাকা পড়ে এখন সে বারসিংগার, বারবনিতা-বারাঙ্গনা। সমাজ তাকে দেখে অন্য চোখে, দেখেনা তার মনটা। যে মনটা চেয়েছিলো ভালোবাসতে, একটা স্বপ্নের তাজমহল গড়তে, সেই মনটা ভেঙে দেওয়ার জন্য কে বা কারা দায়ী। কীজন্য আজ তাকে পরিবর্তন হতে হলো স্বপ্না থেকে রিংকিতে, এর উত্তর অন্ধ সমাজের কাছে নেই।

URO GROUP OF COMPANIES

DN-13, SECTOR - V, Salt lake City, Kol-106
Tel : 033-9230702964 / 9230703002
Website : www.urogroup.net

URO মানে সফল জীবন
URO মানে আয়ের সুযোগ
URO মানে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
URO কে নিয়ে ঘর বাঁধুন

সুস্থ থাকুন-ভরসা রাখুন

আপনার বিশ্বস্ত এজেন্ট ঃ-

সুজিত সাঁতরা

RANK এ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার
BRANCH-AMTA (চাঁদনী মোড়)
BRANCH No. 125
(M) 9330997057, 8001333477, 9163486520

বিঃ দ্রঃ ঃ-
R.D. + FIXED + MIS
রেকারিং ডিপোজিট, এককালীন জমা, এককালীন জমা রেখে প্রতি মাসে সুদ সংগ্রহ-এর ব্যবস্থা আছে।

উন্মেষ

অনিতা খোটেল

আগুন - আগুন - আগুন ..... চিৎকারে গ্রামের গভীর রাতের শান্ত নীরব গম্ভীর আকাশ, বাতাস সমগ্র পরিবেশ নিমেষেই খান খান হয়ে গেল। তার চেয়ে আরো ভয়ংকর - ভীষণ হয়ে উঠলো, মন্ডল পাড়ার ঐ ঘরের আগুন। পাশাপাশি সব আবার খড়ের বাড়ী। লাগোয়া। এর থেকে ক্ষণিকের দাবানলের মত পুরো কৃষ্ণপুর গ্রামটাই শেষ হতে পারে। পৌষমাসের শেষে কনকনে শীতের রাত। সারাদিনের চাষের কঠিন খাটা খাটুনিতে সকলেই বেশ কাহিল হয়ে অঘোরেই ঘুমোচ্ছে, কাঁথা চাপা দেওয়া আরামের ঘুম। চার দেওয়ালের বাইরে কী হচ্ছে কে তার আর খবর রাখে? হবেই বা কী করে?

সন্ধ্যাতে শুধু মন্ডলদের গোয়াল ঘরে মশা তাড়াতে ও ঠান্ডা থেকে গরমের স্থিতি রচনা করতে গিয়ে, পোলের ধোঁয়া থেকেই ক্রমে ক্রমে পাট কাঠিতে লেগে আগুন লেগেছে চালে। আর সময়েই তা নিভিয়ে তুলতে না পারলে, গলাগলি ঘর গুলিও আস্ত থাকবে না। ঘুমন্ত মানুষজনেরও জীবন্ত সমাধি হবে। তা প্রায় হাজারখানেক। সমগ্র গ্রামকেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুমিত সেই মাত্র উঠে বাইরের দিকে তাকিয়েছে। তাদের বাড়ী থেকে তিনশো মিটার পূর্বে মন্ডল পাড়া। রাত তখন দেড়টা, বাইরে কেউই নেই। থাকারও কথা নয়। আগুন - সেইই প্রথম দেখে, আর চিৎকার তারই। শুধু মুখেই নয়, বলতে বলতে হাতে দু'খানি বালতি নিয়ে নিমেষেই হাজির। আর গোয়াল ঘরের খড়ের চালের আগুন নেভাতে না নেভাতেই মধু মন্ডলের দোতলায় মাটির ঘড়ের সিঁড়ি ও চালাতে আগুন ধরে গেল। আকাশটাও লালাভ ..। তখন আশপাশ হতে অনেকেই এসে গেছেন। সকলের মুখেই গভীর আতংক - উৎকণ্ঠা। ভয়ার্ত পরিবেশ চারিদিকটাই বেশ গ্রাস করেছে। আরো বড় ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটে!

শুধু মন্ডলের দশ বছরের কন্যা প্রতিমা ও স্ত্রী মালতী দেবী সেই দোতলায় আটকে। নীচে নামতেই পারছেন না, তারাও বাঁচতে চীৎকার জুড়ে দেন ''বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও .....''। তাদেরও সময়ে উদ্ধার করতে না পারলে, লেলিহান আগুনে নির্ঘাৎ তারা আগুনে জ্যান্তই পুড়ে মরবে! সকলে বেশ কিংবর্তব্য বিমূঢ়!

সুমিত আগত সঙ্গী সাথী-গ্রামবাসীদের পুকুর থেকে লাইন দিয়ে জল তোলা ও ছোঁড়া অব্যাহত রাখতে বলে, দ্রুতই দু'কড়া একটি মই হাতের কাছে পেড়ে এক তলার চালে লাগিয়ে দোতলায় উঠে গেলো। চারিদিকে তখন ধোঁয়ায় ভর্তি। চোখ মুখ জ্বালা করছে। ধোঁয়া অন্ধকারকে আরো ঘন অন্ধকারেই পরিণত করেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। সকলেই বেশ উদ্বিগ্ন-অধীর অসহায়! আগুন চাল পোড়াচ্ছে মট মট শব্দে! প্রতিমা, জ্ঞান হারিয়ে বারান্দায় লুটিয়ে পড়েছে। তাই সেই অবস্থায় সুমিত কোলে করে বেশ দ্রুত কিন্তু সন্তর্পণে নীচে নামিয়ে অন্যের কোলে দিয়ে - চোখে মুখে জল দিয়ে রামবাবু ডাক্তারকে ডাকতে বলে। তারপর আবার মই দিয়ে উপরে উঠে শংকায় অর্ধমৃত মালতী দেবীকেও উদ্ধার করে। আর ঠিক সেই সময় মই এ উঠে উপরে জল ঢালতে গিয়ে একটা জলন্ত পোড়া কাঁড়ি তার মাথায় পড়ে। সুমিত মই থেকে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়! মাথা ফেটে গেছে রক্তক্ষরণও হচ্ছে! সকলে হায়! হায়! করে উঠলো। মধু মন্ডল অন্য ঘরে শুয়ে ছিলেন। তার স্ত্রী ধাতস্থ হলে তাকে তোলেন। তখন আগুনের খেলাও শেষ। মারাত্মক জখমকারীকে নিয়ে সকলেই মত্ত। চারিদিকে ধোঁয়ার কুন্ডলী। পোড়া গন্ধ। জলে ভেসে যাচ্ছে সমগ্র উঠোন। সব চিৎকার থেমে গেছে! নিঝুম থম থমে বাতাবরণ। শেষ পর্যন্ত সুমিতকে বাঁচানো যাবে তো?

ডাক্তার এসে সুমিতের জ্ঞান ফেরালেন। মাথায় বারোটি সেলাই দিতে হলো। পুড়েও গেছে অনেক স্থানে। ঘন্টাখানেক পর জানা যায় ''কোন চিন্তার কারণ নেই''।

কিছুদিন পরে মঙ্গল বার। সুমিত সাইকেলে রাধাপুর গ্রামে চলেছে। পথেই 'বিবেকানন্দ মূল্যবোধ শিক্ষা নিকেতন'। প্রার্থনার পর একটি শিশুর মুখে বাণী শোনে। - ''পরার্থে যারা জীবন ধারণ করে, তাদের জীবনই সার্থক'' বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিশুটির বলার ভঙ্গীমা সুমিতের বেশ ভালোই লাগল।

সুমিত ও তাই মনে প্রাণে একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করে। মানব জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে - নিজেকে পরের জন্য বলি প্রদত্ত করেই গড়া। তবেই বাঁচার সার্থকতা আসতে পারে। মানব সমাজ সার্থক হতে পারে। আমার আমার করে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা আজ মনুষ্যত্ব - মানবতা বিবেককেই ধ্বংস করছি। যা কাম্যই নয়। প্রকৃত মানব হৃদয় উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হলে মানব সমাজ সবারই হয়। সবার বাঁচার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বলিষ্ঠ হয়।।

পাশের বাড়ীতে রেডিও হতে সে সময়ই শোনা যায় কবির কথা - ''আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসেনি কেহ ধরণী পরে। সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'' আর তখনই মধ্য আকাশে সূর্যটাও বেশ সুদৃঢ় দীপ্ত তৃপ্ত মনে হচ্ছে সুমিতের।

মা

অপর্ণা মাজী

মা আমার মা
মায়ের নেইকো তুলনা
মায়ের মুখের হাসি
আমি দেখতে ভালোবাসি
মায়ের যখন হয় দুঃখ
আমার তখন কাঁপে বক্ষ
মা আমার সাহস জোগায়
সহজ ভাবে বাঁচতে শেখায়
মা যে দিলো জন্ম আমার
দেখালো ধরার রূপের বাহার
মাগো তুমি পারো আমার
সুখ দুঃখ বুঝতে
মাগো তুমি পাশে আছো
আমার সুখ দুঃখেতে
তোমার আদরে বড় হয়েছি
দুঃখ পেলে তোমার কোলেই মাথা রেখেছি
তুমিই আমার জন্মদাত্রী
তুমিই আমার ভাগ্যদাত্রী
মাগো তোমার আছে অনেক মহিমা
তুমিই আমার একমাত্র প্রতিমা
আমার প্রিয় মাকে আমি
সবার থেকে ভালোবাসি
তাইতো আমি সর্বক্ষণ দেখতে চাই
আমার প্রিয় মায়ের মুখের হাসি।

ক্ষতটা বেঁচে থাকুক

প্রণব কুমার দাস

সেই ক্ষত
সেদিনের সেই ক্ষত
যেদিন চোখের সামনে জল্লাদগুলো
বাবাকে কেড়ে নিলো
সেই ক্ষত শুকোয়নি
শুকোতে দিইনি
মিলিয়ে যেতে দিইনি,
শোক সামলেও
জেদকে ছেড়ে যেতে দিইনি,
ক্ষতটা জ্বলজ্বল করুক
ততদিন পর্যন্ত —
ক্ষতটা মিলিয়ে গেলে বিস্মৃত হতে পারে জেদ
হারাতে পারে লড়াই করার ক্ষমতা,
শোকের আয়ু আর কতদিন?
নাজিম হিকমত বলেছেন,
বিংশ শতাব্দীতে মানুষের শোকের আয়ু
বড়জোর এক বছর।
একবিংশতে হয়তো বা আরো কম,
তাই ক্ষতটাকে শুকোতে দিইনি —
এই ক্ষতটা —
আমার শপথ পূরণের প্রেরণা
এগিয়ে চলার মন্ত্র
আমার লড়াই করার উত্তরাধিকার
পরিবারের অবলম্বন,
ক্ষতটা থাকুক ততদিন পর্যন্ত —
ক্ষতটা থাকুক --
যতদিন জল্লাদগুলো ধ্বংস না হয়,
নিশ্চিহ্ন করতে না পারি
না - ওভাবে নয় -
তোমাদের মতো ওভাবে নয়।
তোমরা বাবাকে মেরেছো
বাঁচিয়ে রেখেছো সকলের হৃদয়ে
তাই — তোমাদের
বিচ্ছিন্ন করতে চাই সমাজ থেকে -
বিচ্ছিন্ন করতে চাই সীমানা থেকে -
চাই মানুষের স্মৃতি থেকে।
তোমাদের গর্বিত গতি
উদ্ধত ভঙ্গি
নিশ্চিহ্ন হবেই —
আগমনের অপেক্ষায় সেইদিন
ক্ষতটাকে বাঁচিয়ে রাখবো ততদিন
তারপর যায় যাক মিলিয়ে,
ক্ষতটা —।।

বিবেকের কাছে —

তপন কুমার ভৌমিক

ভাল আছি আমরা,
ভেতর থেকে বলে ওঠে; বেশ ভাল।
কণ্ঠস্বরে, না তেমন কিছুনা
খুঁজতে থাকে, ভাষার মানে
পাশ ফিরে তাকায়, এক মনে কিছু একটা
লোকের আনা-গোনা,
বেশ ভাল, বেশ ভাল .....
আহা - হা, আহা - হা, আরো কিছু আরো কিছু .....
কিন্তু কেন? কেন থাকবে না তুমি,
আমাদের মাঝে?

প্রশ্ন আমাকে নয়, তাকে —
শাড়ির রঙের জেল্লায় ঝলসায় চোখ,
মলিন মুখ ফেরায় —
কিছু তো করার নেই, কিন্তু কেন?
এখনও থাকবে চুপ,
বিবেকের কাছে?

সংবাদ প্রতিদিনের শুভেচ্ছা

বাংলার মুখ (৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০)

কুপ্রথা ও বুটাইদার সঙের দল

স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে পাঠকের সামনে হাজির করা জেলাভিত্তিক সংবাদপত্রগুলির বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের প্রতিবেদনগুলি আমাদের মননের বৈচিত্রকেই তুলে আনে। অবাক করে। ভাবায়ও। হাওড়ার কাগজ 'জেলার খবর সমীক্ষা'-তে কাসুন্দিয়ার বুটাইদাকে নিয়ে প্রতিবেদনটি অনবদ্য। এই ধরনের প্রতিবেদন যে কোনও সংবাদপত্রের সম্পদ। হাওড়ার কাসুন্দিয়ার বুটাইদার সঙের দল সামাজিক কুপ্রথা, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রুপ ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই মানুষগুলি নিজেরাই ইতিহাসের অংশ হয়ে যান। এঁদের খবর আরও বেশি করে তুলে ধরুক 'জেলার খবর সমীক্ষা'। জেলার জনপ্রতিনিধিদের ফোন নম্বরের তালিকাটি প্রকাশ করায় বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

বাংলার মুখ (তারিখ ১২ জুলাই ২০১০)

বাঙালির অতি প্রিয় এবং অপরিহার্য দুটি বিষয়কে বিষয়বস্তু করে প্রকাশিত হয়েছে জেলার খবর সমীক্ষা সংবাদপত্র। বিষয়বস্তু দু'টি হল আম এবং পঞ্জিকা। বাংলা বছর শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকদিনের আগে পরে বাঙালির ঘরে চলে আসে এই দু'টি জিনিষ। এই দুইয়ের প্রায় ইতিহাস তুলে এনেছে এই পত্রিকা। এবং তা পাঠকদের সামনে পেশও করা হয়েছে বেশ আকর্ষণীয় উপায়ে। আমের প্রকৃতি থেকে পুষ্টিগুণ, আমের ইতিহাস থেকে আমতত্ত্ব - সবই রয়েছে পাঠকদের জন্য। অন্যদিকে পাঁজির ক্ষেত্রেও একই ভাবে বিভিন্ন তিথির গোলমাল, বর্ষপঞ্জীর টুকিটাকির পাশাপাশি পাঁজিতে কোথায় চালাকির অবকাশ রয়েছে, তাও জানিয়ে দিয়েছে এই পত্রিকা। সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট পরিসরেই বেশ দক্ষ লেখনীতে এই দু'টি বিষয়কে যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয়তা ও জানার আগ্রহ-দুটোই মেটার মতো উপকরণ এই লেখায় রয়েছে।

বাংলার মুখ (১০ সেপ্টেম্বর ২০১২)

এবার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত মাসিক বা সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্র-পত্রিকার দিকে একটু চোখ দেওয়া যাক। প্রথমেই বলতে হবে 'জেলার খবর সমীক্ষা'র কথা। হাওড়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকাটির বেশিরভাগটাই জুড়ে রয়েছে স্থানীয় খবরে। হাওড়ার একাধিক স্থানীয় খবর যেমন রয়েছে, তেমনই ধারাবাহিকভাবে হাওড়া জেলার ইতিহাস তুলে ধরেছেন শ্যামল বেরা।

তালতলা দর্পণ (এপ্রিল - জুন ২০১১)

প্রসঙ্গ হাওড়া — আলোচনা

অবলুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার — ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

কলকাতার ইতিহাস নিয়ে যে পরিমাণ চর্চা হয়েছে, হাওড়ার ইতিহাস নিয়ে অতটা হয়নি। হাওড়ার ইতিহাসের অনেকগুলি অনালোচিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন সুকান্ত মুখোপাধ্যায় আমতা থেকে প্রকাশিত 'জেলার খবর সমীক্ষা' শীর্ষক পাক্ষিক পত্রিকায়।

'ফিরে দেখা — জেলা হাওড়া' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ইতিহাসনিষ্ঠ গবেষণার আলোয় হাওড়া জেলার নামকরণ, পুরোনো দিনের গ্রামভিত্তিক জনগণার ইতিহাস, প্রত্নবস্তু, হাওড়ার খ্রীষ্টান কবরখানার বিস্তারিত বিবরণ, সতীদাহের ইতিহাস, বাংলার সুলতানী আমলের প্রাপ্ত মুদ্রার বিবরণ এবং জেলার শিল্প বাণিজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস। লেখার মূল আকর্ষণ অজস্র দুষ্প্রাপ্য পুরোনো ছবি যা লেখাটিকে প্রামাণ্য করেছে। ভোটবাগান মঠের জমি হস্তান্তরের মূল সনদ, লর্ড ক্লাইভের জমিদারীর দলিল, ফারুকশিয়ারের ফরমানের প্রতিলিপি, সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ কুঠি, সুলতানী আমলের মুদ্রার ছবির পাশাপাশি রয়েছে শিবপুর, চক্রবেড়িয়া ও ডোমজুড়ে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির বিবরণ। খ্রীষ্টান কবরখানাগুলির সমাধিলিপি ও ছবিগুলিও যথেষ্ট আকর্ষক। হাওড়ার ইতিহাসে নবতম সংযোজন লেখাটি হাওড়াবাসী তো বটেই, যে-কোন ইতিহাসপ্রেমী পাঠকেরই অবশ্যপাঠ্য। পত্রিকাটি নিয়মিত তালতলা দর্পণের দপ্তরে পাচ্ছি, বন্ধ করবেন না।

নূতন জনকথা (শারদ সংখ্যা ১৪১৮)

প্রসঙ্গ ঃ 'জেলার খবর সমীক্ষা' — একটি প্রতিবেদন

দুঃখহরণঠাকুর চক্রবর্তী

হাওড়া জেলার আমতা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা জেলার খবর সমীক্ষায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 'ফিরে দেখা — জেলা হাওড়া'। লেখক সুকান্ত মুখোপাধ্যায়। মোট ৩০টি পর্ব এ যাবৎ প্রকাশিত। রয়েছে হাওড়ার নানা অকথিত ইতিহাস।

১ম পর্বে — বেতড় বন্দর, সরস্বতী নদী, রাঢ় বাংলার মৌজা ভাগ, ক্লাইভের জমিদারীর দলিলের ছবিসহ আনুপূর্বিক ইতিহাস।

২য় পর্বে — হাওড়ার নামকরণের ১৮১৫ সালে পাওয়া তথ্য (Monumental Register)।

৪র্থ থেকে ১৯ পর্বে আছে — আমতা, উলুবেড়িয়া, আন্দুল, বালী, বেলুড়, ডোমজুড় প্রভৃতি এলাকার ১৮৬৯ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুসারী বিবরণ, বাণিজ্যিক লেনদেন, পর্তুগীজ, আর্মানী, ফরাসী আর ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ভোটবাগান মঠের জমি হস্তান্তরের বিবরণ, জোব চার্ণকের উলুবেড়িয়া বাসের কারণ, স্ট্রেনশ্যাম মাস্টারের ডায়েরী, East India company-র despatch book এ Original correspondence এর সূত্রে তৎকালীন অবস্থার বিবরণ, চার্ণকের মৃত্যু, কোলকাতা বিক্রির দলিল।

২০-৩০ পর্বে আছে ১৮৪০ এ হাওড়ায় উদ্ধার হওয়া ৩১টি সুলতানী মুদ্রার বিবরণ। বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাস, হাওড়ার খৃস্টান সমাধিক্ষেত্র-এর উল্লেখ। হাওড়ার প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির ছবিসহ বিবরণ। ছবি আছে — ভোটবাগান মঠের জমি কেনার মূল দলিল, Elisa kirkall (1735), Jan Van Ryne (1754), Francis Swaine (1763) এর ছবি, মহিয়াড়ীর সিমাফোর টাওয়ারের, হাওড়ায় পাওয়া একমাত্র সতীফলক, Captain Alexander Hamilton এর An Account of the East Indies, Gastaldi's Map, হুগলীর ওলন্দাজ কুঠি, Rennell এর map এ উলুবেড়িয়া, ইলিয়াস শাহের মুদ্রা, valentijn's এর Oud En Nieuw Oost-Indien এর প্রচ্ছদের ছবি, কবরখানাগুলির নির্বাচিত Epitaph এর ছবি। লেখায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সূত্রের উল্লেখ আছে। প্রচুর পুরানো পত্রপত্রিকা, Asiatic Journal এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

WORLD PEACE FOUNDATION

New Age Masters'
Pyramid Meditation Centre, Howrah
357/6, Belilious Road, 1st Floor,
Howrah-711101
Meditation a doorway to eterual peace

কেন ধ্যান করবেন ?

- ধ্যানের দ্বারা সমস্ত শারিরীক ব্যাধি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য ধ্যানের মাধ্যমেই কেবল মাত্র যে কোন ধরনের দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় সম্ভব।
- ধ্যানের দ্বারা আমাদের মধ্যে খারাপ অভ্যাসগুলি দূর হয়ে যায়।
- ধ্যানের দ্বারা আমাদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি প্রকট হয়।
- ধ্যানের দ্বারা আমাদের দুরন্ত মন ক্রমশ শান্ত হয়ে যায় এবং মনের মধ্যে এক আশ্চর্য আনন্দ বিরাজ করে, যেটা আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে।
- ধ্যানের দ্বারা খুব সহজে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।
- ধ্যানের দ্বারা স্মৃতি শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।
- ধ্যানের দ্বারা জন্মের উদ্দেশ্য জানতে পারা যায় অর্থাৎ কেন আমরা এই পৃথিবীতে মানব জন্ম গ্রহণ করেছি।

ধ্যানের দ্বারা জীবনে উন্নতি লাভ করা

- ভগবান গৌতমবুদ্ধ দ্বারা আমরা খুবই সহজ সরল পদ্ধতিতে 'অনাপনাসতী' ধ্যান জানতে পারি।
- 'অনাপনাসতী' ধ্যান হল খুবই সহজ সরল ধ্যান। ধ্যানের সময় বাবু হয়ে বসে (সুখাসন) একটি হাতের আঙুলগুলির মধ্যে আর একটি হাতের আঙুলগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে (কাঁচি কাট) কেবল মাত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস উপর মনটাকে নিয়ে যাওয়া।

অনাপনাসতী ধ্যানের নিয়ম

- প্রথমে চোখ বন্ধ রাখুন, যদি চশমা ব্যবহার করেন তাহলে চশমা খুলে চোখ বন্ধ করুন।
- তারপর একটি আসনের মধ্যে বাবু হয়ে অর্থাৎ পা ভাঁজ করে বসুন (সুখাসন) এবং ডান হাতের আঙুলগুলিকে বাঁ হাতের আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন (কাঁচিকাট)। যদি কেহ বাবু হয়ে বসতে না পারেন তাহলে চেয়ারের মধ্যে বসে বাঁ পায়ের উপর ডান পা অথবা ডানপায়ের উপর বাঁ পা ক্রস করে রাখুন। তারপর একটি হাতের আঙুলের ভিতর আর একটি হাতের আঙুলকে ঢুকিয়ে দিন।
- তারপর স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিন। মনটাকে কেবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে নিমজ্জিত রাখুন। দেখা যাবে আমাদের মনের মধ্যে অনেক চিন্তা প্রবেশ করছে বা চিন্তা ঢোকার চেষ্টা করছে। আপনি কিন্তু মনটাকে

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নিমজ্জিত রাখার চেষ্টা করুন। দু-একদিন পরে দেখবেন অভ্যাস হয়ে গেছে। তখন আর কোন অসুবিধা হবে না।

- 'অনাপনাসতী' ধ্যান প্রতিদিন করবেন। এই ধ্যান যে কেহ করতে পারেন। যে কোন জায়গায় করতে পারেন এবং যে কোন সময়ে করা যায়। 'অনাপনাসতী' ধ্যান কতক্ষণ করবেন সেটা ঐ ব্যক্তির বয়সের উপর নির্ভর করে। কারও বয়স যদি ২০ বছর হয় তিনি ২০ মিনিট ধ্যান করবেন এবং কারও বয়স যদি ৩০ বছর হয় তাহলে তিনি ৩০ মিনিট ধ্যান করবেন। যারা দূরারোগ্যব্যাধীতে ভুগছেন তাঁরা ধ্যানের সময়ের পরিমানটা বয়সের চারগুণ-পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিন। পারলে আরও বেশী করে ধ্যান করুন। যত বেশী ধ্যানের মধ্যে থাকবেন তত দ্রুত রোগ নিরাময় হবে এবং সুস্থ জীবন ফিরে পাবেন। ধ্যানের সময় যদি ক্লাসিক্যাল মিউজিক, ভক্তিগীতি বা যে কোন ধরনের হাল্কা মিউজিক ব্যবহার করেন তাহলে ধ্যানের গভীরতা বা সাফল্য দ্রুত হয়।
- কেহ যদি পাহাড় পর্বতে, সমুদ্রের ধারে, ঝরনার পাশে এইরকম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে বসে ধ্যান করেন তাহলে তাদের ধ্যানের শক্তি স্বাভাবিকের থেকে তিনগুণ থেকে পাঁচগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় ফলে ধ্যানের সাফল্য খুবই দ্রুত হয়।

- কোন ব্যক্তি যদি পিরামিডের মধ্যে ধ্যান করেন তাহলে ধ্যানের শক্তি এবং এনার্জি অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং সহজেই দ্রুত ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করে এবং ধ্যানের উদ্দেশ্য সফল হয়।
- আসুন আমরা প্রত্যেকে অত্যন্ত সহজ সরল পদ্ধতিতে 'অনাপনাসতী' ধ্যান করি, অপরকে ধ্যান শেখাই এবং প্রত্যেককে ধ্যান করার পরামর্শদান করি। এই ধ্যানের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকে সুস্থ সুন্দর জীবন লাভ করি। আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এমনকি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে অনাবিল আনন্দ বিরাজ করুক।
- ধ্যানের বিষয়ে এর থেকে বেশী কিছু জানার জন্য বিনামূল্যে পরামর্শ নিন। যোগাযোগ করতে পারেন নিম্নলিখিত ব্যক্তির সাথে

Dinesh Chandra Shaw : 09804419890
Pankaj Shaw : 09230563259
Swami Ramtirth : 09143406929
Jagrit Shaw : 09830410030
Ashutosh Shaw : 09163156541
E-mail : pankaj.shaw02@yahoo.com